মরুর মাঝারে বারির ধারা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একটাকা আট আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সমর্পণ

শৈশবের সহপাঠী

তরুণ যৌবনের ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী

সাহিত্যসাধনায় সহধর্ম্মী

স্বভাব-নিষ্ঠা দৃঢ়তা ও সততায় বরেণ্য

অভিন্ন হৃদয় সহৃদয় সুহৃদ

বজবজ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের

প্রথম বাঙ্গালী চেয়ারম্যান

রায় সাহেব শ্রীযুত হরলাল হালদারের

করকমলে

অতীতের মিলন-মধুর দিনগুলির

স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ

এই গ্রন্থখানি সমর্পিত হইল

পরিচয়

সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক অনুজোপম স্নেহভাজন শ্রীযুত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যেই 'মরুর মাঝারে বারি ধারা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এজন্য তিনি আয়াস, প্রয়াস ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই।

'অদৃষ্টের ইতিহাস' যখন প্রকাশিত হয়, তাহার পরিচয় পত্রে ইঁহার স্বনামধন্য অগ্রজ সুহৃদ্বর শ্রীযুত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের আকস্মিক অসুস্থতার কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আজ এই গ্রন্থের পরিচয়পত্রে তাঁহার আরোগ্যলাভের কথা লেখকের চিত্তে নিবিড় আনন্দের সঞ্চার করিতেছে।

বাঙ্গলার এই আদর্শ সাহিত্য প্রতিষ্ঠানটির দুই যশস্বী সত্ত্বাধিকারীর সহৃদয় আচরণ এতই হৃদয়স্পর্শী ও একান্ত স্মরণীয় যে, ইহা ভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় নূতন কিছু বলিবার থাকে না এবং না বলিলেও মনে হয় যে, সবই অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

বাঙ্গলার ছাত্র-ছাত্রীদের যে চিত্র গ্রন্থখানিতে রূপায়িত হইযাছে, তাহা তরুণ-তরুণী তথা তাহাদিগের অভিভাবকবর্গের প্রীতিপ্রদ হইলেই, লেখকের উদ্যম ও পরিশ্রম সার্থক হইবে।

আরিয়াদহ, চব্বিশ পরগণা
শ্রাবণ, ১৩৪৬

বিনীত
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মরুর মাঝারে বারির ধারা

সহপাঠী

এক

স্কুলের ছুটীর পর ছেলেরা অনেকগুলি দলে বিভক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল।

স্কুলটির নাম দেশবন্ধু ইনষ্টিটিউসান। হুগলী জিলার রাধানগর নামে এক বিখ্যাত অঞ্চলে স্কুলটি অবস্থিত। জায়গাটি পল্লীগ্রামের সামিল হইলেও, বহু বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির প্রাদুর্ভাবে ও মিউনিসিপালিটীর বিধি ব্যবস্থায় অনেকটা সহরের মতই হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তা-ঘাটগুলি সবই পাকা, নানাবিধ দোকান-পাটের বাহার, বাজার-হাটের ব্যবস্থাও কেতা-দুরস্ত; সন্ধ্যার পর রাস্তাগুলির ধারে একশো হাত অন্তর এক একটি কেরোসিনের আলো লণ্ঠনের ভিতর লম্বা খুঁটির মাথায় টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলে এবং গ্রাম্য-চৌকিদারের পরিবর্ত্তে পুলিশ-থানার উর্দ্দীপরা দুই জন পাহারাওয়ালা পালা করিয়া পাহারা দেয়।

এই অনুপাতে স্থানীয় উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুলটির অবস্থাও উন্নত এবং সহরের স্কুলগুলির আদর্শেই চালিত হইতেছে। পাকা বাড়ী, বড় হল, বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন শ্রেণী, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, খেলা শিখিবার ও খেলিবার কত সব ব্যবস্থা। আবার, এই সব সুযোগ সুবিধার সঙ্গে এমন শৃঙ্খলাও চালু হইয়াছে যে, পাণ হইতে বুঝি চুণটুকু খসিবারও যো

নাই। মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখটির মধ্যে মাহিনা দাখিল না করিলেই দৈনিক এক আনা হিসাবে জরিমানা। আবার মাসটির ভিতরে জরিমানার সহিত মাহিনাটি মিটাইয়া না দিলে আরও মুস্কিল, রেজিষ্টারী খাতা হইতে বাকিদার ছেলেটির নাম কাটা যাইবে। অবশ্য হেডমাষ্টার সেই অবস্থাতেই তাহাকে ক্লাসে বসিয়া পড়া-শুনার অনুমতি দিলেও ক্লাসের কোন পরীক্ষায় তাহাব যোগ দিবাব উপায় নাই। এমন ঘটনা ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে এবং ঘটনাচক্রে আজই ঘটিয়াছে। সেই সূত্রেই ছেলেদের জল্পনা ও কল্পনা।

দেশবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউসানের মোট ছাত্রসংখ্যা তিন শতের কম নয়। তৃতীয় শ্রেণীতেই বত্রিশ জন ছেলে পড়ে। তাহাদের মধ্যে একত্রিশ জনের নাম রেজেষ্টারী খাতায় আছে, এক জনের নাম কয় মাস ধরিয়া খাতায় উঠে নাই ; সেই নামটিই আকবর আলি মোল্লার। খাতায় এখন যদিও তাহার নাম নাই, কিন্তু নূতন ক্লাসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে তুলিবার সময় প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রতি বৎসর যে নামগুলি ডাকিতেন, আকবরের নাম তাহাতে গোড়ার দিকেই বরাবর শুনা যাইত। সপ্তম শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রমোশনের দিন আকবরের নাম ছিল দশ জনের নীচে ; কিন্তু বৎসরান্তে পঞ্চম শ্রেণীতে যে দিন উত্তীর্ণ ছেলেরা প্রমোশন পায়, সে দিন দেখা গিয়াছিল—আকবরের নাম স্থান পাইয়াছে পাঁচ জনের পরে। তৃতীয় শ্রেণীতে আরও দুই ধাপ আগাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এই শ্রেণীতে তিন জন ছাত্রের পরেই আকবরের নাম স্থান পাইয়াছে! ছেলেটির এমনই দুর্ভোগ যে, এতগুলি ছেলের মধ্যে তাহার নামটিই শুধু রেজেষ্টারী খাতায় নাই, অথচ প্রত্যহই সে ক্লাসে আসে, পড়া-শুনা করে, ছুটীর পর বাড়ী যায়, মুখখানি তাহার সদা সর্ব্বদাই বিষণ্ণ ও ম্লান।

ক্লাস বসিতেই শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের নাম যখন ডাকিতে থাকেন,

ছেলেরা ক্রমে ক্রমে 'প্রেজেণ্ট স্যার' বলিয়া হাসিমুখে সাড়া দেয়,—ক্লাসে 'প্রেজেণ্ট' থাকিয়াও আকবরের তাহাতে যোগ দিবাব উপায় নাই; শুধু সে রুদ্ধ নিশ্বাসে সহপাঠীদের নামগুলি শুনিয়া যায়, বুকখানি তাহার দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে, বড় বড় দুইটি চোখের কোলে অশ্রু আসিয়া জমিতে থাকে, ছেলেটি যেন জোর করিয়াই তাহা চাপিয়া রাখে—বাহিরে আসিতে দেয় না।

নামগুলি ডাকা হইযা গেলে ক্লাসেরই কতকগুলি ছেলে চোখে ও মুখে তীক্ষ্ণ হাসি ফুটাইয়া যেরূপ ভঙ্গীতে আকবরেব দিকে চাহিতে থাকে, আকবর তাহার অর্থ স্পষ্টই বুঝিতে পারে। সহপাঠীদের এই বিদ্রূপের হাসি যেন কাঁটার মত তাহার গায়ে বিঁধিতে থাকে। আবার কতকগুলি ছেলে যে, মুখগুলি তাহাদের ম্লান কবিয়া ছল ছল চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া মনের নিবিড় বেদনা জানাইযা দেয়, তাহাও বুঝিতে আকবরের বিলম্ব হয় না। ইহাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয সহপাঠী নির্ম্মল, পরিতোষ ও নবীনের কথাই তুলিবার মত। এই তিনটি ছেলেব সহিত পরীক্ষায় ও পড়াশুনায় তাহার রীতিমত প্রতিযোগিতা চলে, অথচ ইহারাই আকবরের ব্যথায অতিমাত্রায ব্যথিত, তাহার এই দুর্ভোগের জন্য তাহাদের দুঃখের অন্ত নাই।

এই সমৃদ্ধ গ্রামখানির বাহিবে আরও দুই তিন খানি গ্রামের পরে প্রায় আড়াই ক্রোশ তফাতে আকবরদের গ্রাম। এই আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তাহাকে এই স্কুলে পড়িতে আসিতে হয়। আকবরদের অবস্থা বরাবর ভালই ছিল। তাহার বাবা ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে কাটা-কাপড়ের কারবার করিতেন। নিজে দর্জ্জীর কাযে সুদক্ষ; কারবারে যাহা উপায় করিতেন, তাহাতে সেখানকার খরচ চালাইয়াও দেশে যাহা পাঠাইতেন, তাহাতে সংসার স্বচ্ছলভাবেই চলিয়া যাইত। কিন্তু প্রায় বৎসর ফিরিতে

চলিল, তাঁহার কারবারের অবস্থা হঠাৎ মন্দ হইয়া পড়ে; আমদানীও কমিয়া যায়। ঠিক মত বাড়ীতে টাকা আসে না, কাযেই নানা বিষয়েই অভাব দেখা দিয়াছে। বরাবরই সে নিয়মিত সময়ে স্কুলের বেতন দিযাছে, কিন্তু প্রায় ছয মাস হইতে চলিল, একটি মাসের বেতনও সে জমা দিতে পারে নাই। প্রথম মাসেই যখন তাহার নাম কাটা যায় এবং হেড-মাষ্টার তাহাকে ডাকিয়া সে জন্য কৈফিয়ৎ চাহেন, আকবর তখন ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে তাহাদের দুরবস্থার কথা জানাইয়াছিল; কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিয়াছিল, বাবা তিন মাস বর্ম্মা থেকে কিছুই পাঠান নি, স্যার। কি ক'রে যে আমাদের দিন চ'লছে ভগবানই জানেন। বাবার কাছ থেকে টাকা এলেই আমি মাইনে চুকিয়ে দেব। যদি আমাকে ক্লাসে আসবার পারমিসন দেন, স্যার, তবেই আমাব পড়া হয়; নইলে—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে চুপ করিয়াছিল, আর তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় নাই।

হেডমাষ্টার মহাশয় চাহিবা দেখিয়াছিলেন, ছেলেটির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে, সুন্দর সুপুষ্ট মুখখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে, মুখের কথা তাহার অশ্রুর আবেগে রুদ্ধ হইযা গিয়াছে। মুখখানি রীতিমত গম্ভীর করিয়াই হেড-মাষ্টার এই বাকিদার ছেলেটির বিচার করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু ছেলেটির মর্ম্মবাণী বিচারকের মুখের গাম্ভীর্য্য কোথায় সরাইয়া দিয়াছিল, এক নিমিষে তাঁহার মনটিও বুঝি ব্যথায় ভরিযা গিয়াছিল; কাযেই ক্লাসে উপস্থিত থাকিবার বিশেষ অনুমতি তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিতে আকবরকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই।

তাহার পর আরও কয় মাস কাটিয়াছে, কিন্তু অবস্থা তাহাদের ফিরে নাই, বরং আরও খারাপ হইয়াছে। সেই সময় বর্ম্মায় এক হাঙ্গামা বাধে। এক দল বর্ম্মী বিদ্রোহী হইয়া চারিদিকে লুট-তরাজ আরম্ভ করে।

আকবরের বাবার দোকানেও ডাকাতি হইয়া যায়। বিদ্রোহীরা দোকানের মাল-পত্র লুট করে, দর্জ্জীখানার সিলায়ের কলগুলি ভাঙ্গিয়া বিগড়াইয়া দেয়, খাতা-পত্র ছিঁড়িয়া তছনছ করিয়া রাস্তার নর্দ্দমায় ছড়াইয়া ফেলে। আকবরের বাবা তাঁহার দোকানের লোকজনদের লইয়া প্রাণপণে ডাকাতদের বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মাত্র পাঁচ ছয় জন, ডাকাতদের দলে ছিল একশোর উপর গুণ্ডা। সকলেই শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়া চোট খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। পরে পুলিস ও সহরের লোকজন আসিয়া তাঁহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়।

হাসপাতালে প্রায় একটি মাস থাকিয়া আকবরের বাবা যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন তাঁহাকে একেবারে রিক্ত বলিলেই হয়। যথাসর্ব্বস্বই তাঁহার নষ্ট হইয়াছিল। কোনও রকমে রাহা-খরচের টাকাটি সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। এত বড় বিপদের কথা বাড়ীর কেহই জানিতে পারে নাই, তাঁহার মুখেই এই প্রথম সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলেই একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল!

এ দিকে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার দিনও আজ ছুটীর পূর্ব্বে হেডমাষ্টার মহাশয় ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ক্লাসে আকবরকেও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—তিন দিনের ভিতরেই স্কুলের সমস্ত পাওনা পরিশোধ না করিলে সে পরীক্ষা দিতে পারিবে না।

কথাটা থার্ড ক্লাসের ছেলেদের ভিতরেই চাপা থাকে নাই, স্কুলের সকল ছেলেই খবরটা শুনিয়াছিল। সকল ছেলের মুখেই আজ আকবরের কথা। পথে চলিতে চলিতে এই আলোচনাই তাহারা করিতেছিল, পিছনে ফিরিয়া এক একবার এই আলোচ্য ছেলেটিকেও তাহারা দেখিতেছিল।

আকবর বুঝি ইচ্ছা করিয়াই পিছাইয়া পড়িয়াছিল। ছেলেগুলিকে মুখখানি দেখাইতেও যেন তাহার লজ্জা করিতেছিল। কিন্তু তাহার অতি

অন্তরঙ্গ কয়জন সহপাঠী তাহাকে ফেলিয়া যায় নাই, তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। আকবরের মনের কষ্টটুকু ইহারা কয়জন যেন ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্যই তাহাকে ঘিরিয়া চলিয়াছিল। চারিটি রাস্তার সংযোগ স্থল —চৌমাথার কাছটিতে আসিয়াই তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল। এইস্থান হইতে মোড় ফিরিয়া আকবর তাহার গ্রামের রাস্তা ধরিবে।

নবীন কহিল,—তুই এক কায কর ভাই, কাল তোর বাবার কাছ থেকে একখানা চিঠি এনে হেডমাষ্টারকে দে, তা হলেই তোকে একজামিন দিতে দেবে।

পরিতোষ কথাটায় সায় দিয়া কহিল,—ঠিক বলেছে নবীন, তাই কর্, ভাই।

আকবর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্তাবটার প্রতিবাদ করিল ; কহিল, না ভাই, তাতে কিছু হবে না ; বাবা কি লিখবেন? কুড়ি টাকার কাছাকাছি স্কুলের দেনা, কুড়িটা পয়সাও বাবার কাছে নেই। জমি-জেরাৎ সব দেনায় বাঁধা পড়েছে, কারবার যখন গেছে, দেনা কি ক'রে যে বাবা শুধবেন, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। একজামিন আমার দেওয়া হবে না, ভাই! আর তিনটে দিন আসবো ইস্কুলে, দেখা-সাক্ষাৎ হবে, তার পরই, ভাই, খতম।

আকবরের কথাগুলি ছেলেদের বুকে বুঝি গুলির মতই বিঁধিল। নির্ম্মল নামে সহপাঠিটি মনে মনে এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল ; সেই-ই ক্লাসের 'ফার্ষ্ট বয়,' অবস্থাও তাহার সব চেয়ে ভাল ; তাহার বাবা নামজাদা উকীল, খুব পসার অনেক টাকা উপায় করেন। নির্ম্মল এই সময় কহিল,—এক কায করলে হয় না, ভাই? আমাদের ক্লাসে ত বত্রিশ জন ছেলে, আকবরকে বাদ দিলেও একত্রিশ জন হয়। আমরা যদি চাঁদা করে এই টাকাটা তুলি?

কিন্তু ঠিক এই সময় আকবরের মুখের দিকে চাহিতেই কথাটা তাহার বন্ধ হইয়া গেল। আকবরের মুখখানা বুঝি কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই কালো হইয়া গিয়াছিল; নির্ম্মল বুঝিল, এ প্রস্তাব করিয়া সে ভালো করে নাই, ইহাতে আকবরকে ছোট করা হইয়াছে, তাহার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত দেওয়া হইয়াছে,—সে তো এই ছেলেটির মনের গতি জানে? তখনই কথাটা চাপা দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি কহিল,—না ভাই, আকবর, আমার এ কথাটা তোলা ঠিক হয় নি, আমার ভুল হয়েছে।

আকবর কহিল,—ভাই নির্ম্মল, আমার বাবা অনেক পয়সা উপায় করেছেন, অনেক পয়সা অনেককে দিয়েছেনও; আজ আমরা কষ্টে পড়েছি ব'লে, পরের কাছে তিনিও শুধু শুধু হাত পাততে পারবেন না, আমিও পারব না। তা ছাড়া ভাই, বাবার যে শরীর এখন, আমি তাঁকে কিছু ব'লতে পারবো না। বুঝেছি ভাই, এবার একজামিন দেওয়া আমার অদৃষ্টে হ'ল না।

নির্ম্মল আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—আর কি কোনো উপায় হ'তে পারে না, ভাই?

নবীন কহিল,—আচ্ছা, আমরা সবাই মিলে যদি হেড-মাষ্টারকে ধরি? হেডমাষ্টার যদি কথা না শোনেন, সেক্রেটারীকে বলি?

আকবর কহিল,—কিছুই হবে না, ভাই। সবাই দেখাবে আইন; গরীবের দুঃখ কেউ বুঝবে না। আমার জন্য তোমরা কেন মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ, ভাই --

নির্ম্মল কহিল,—এ কষ্ট শুধু মুখের নয় ভাই, মনের। সবাই সারা বছরটি ধরে এক সঙ্গে প'ড়ে এলুম, পড়াশুনায় এত ভালো হয়েও শুধু পয়সার জন্য তুমি ভাই পরীক্ষা দিতে পারবে না! এ কথা মনে হ'লেই আমার কান্না পায়, বুকখানা যেন দমে যায়—

আকবর কহিল,—সব বুঝছি, ভাই। তোমরা আমাকে সত্যি সত্যিই ভালবাসো, কিন্তু কি করবে, আমার নসীব। আজ ভাই আসি, তিনটে দিন আরো আছি ; তার পর—

আর কোন কথা না বলিয়া আকবর তাহার সহপাঠীদের দিকে আর্ত্তদৃষ্টিতে চাহিল, পরক্ষণেই কোঁচার খুঁটটি তুলিয়া চোখ দু'টি মুছিতে মুছিতে গ্রামের পথটি ধরিল। যতক্ষণ আকবরকে দেখা যায়, এই তিনটি ছেলে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

দুই

মক্কেলদিগকে বিদায় দিয়া অনুকূল বাবু তাঁহার নথীপত্র গুছাইতেছিলেন, এবার ভিতরে যাইবেন ; এমন সময় আস্তে আস্তে নির্ম্মল তাঁহার টেবলটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া অনুকূল বাবু চমকিত হইলেন। এ কি! এক রাত্রেই তাহার চেহারা যেন বদলাইয়া গিয়াছে, মুখখানি অত্যন্ত বিরস এবং ছাইয়ের মত বিবর্ণ! ত্রস্তভাবে তিনি কহিলেন,—কি হ'য়েছে রে? এ রকম চেহারা কেন?

কান্নার একটা আবেগ বুঝি নির্ম্মলের কণ্ঠ ঠেলিয়া উঠিতেছিল। সে যেন জোর করিয়াই তাহা রুখিয়া ব্যথাতুরের মতই কহিল,—কাল সারারাত ঘুমুতে পারি নি বাবা!

বাবা বিচলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি, ঘুম হয় নি? কেন, কেন, কি হ'য়েছিল যে—

নির্ম্মল কহিল,—আমাদের ইস্কুলের একটি ছেলের কষ্ট দেখে ভারী কষ্ট হ'চ্ছিল, তাই।

অনুকূল বাবু মনে মনে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—ও! ছেলের মনটি যে অতিশয় কোমল, পরের কষ্ট দেখিলেই তাহা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, ইহা তিনি জানিতেন এবং এজন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ছেলের উচিত অনুচিত অনেক আব্দারও সহ্য করিতে হইত। পাছে আজও ছেলের পক্ষ হইতে বিশেষ কোনো আব্দার উঠে, সেই জন্য তিনি সংক্ষেপেই প্রসঙ্গটা চাপা দিতে উদ্যত হইলেন।

ছেলে কিন্তু সহজে তাঁহাকে অব্যাহতি দিল না। বাবার সংক্ষিপ্ত কথাটার পরই সে সহসা কহিল,—আচ্ছা বাবা, ১লা জানুয়ারী ত আমার জন্ম দিন, আর আপনি তো আগে থাকতেই ব'লে রেখেছেন, এবার আমাকে ঐ দিন একটা বাইসিকেল কিনে দেবেন?

অনুকূল বাবু কহিলেন,—আমার সে কথা মনে আছে, আমি যা ব'লেছি, তা পাবে।

নির্ম্মল কহিল,—নতুন একটা বাইসিকেল যেমন তেমন হলেও তিরিশ টাকার কমে হবে না; আমি তা চাই না, বাবা। তার বদলে আমি এখন কুড়িটি টাকা নগদ চাই।

ছেলের এই কথায় অতিশয় বিস্মিত হইয়া অনুকূল বাবু কিছুক্ষণ তাহার নির্ভীক মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, সে মুখে লোভের কোনো ছায়া পড়ে নাই, বরং দৃঢ়তার একটা আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—এ কথার মানে? কুড়িটি টাকা নগদ নিয়ে তুমি কি ক'রবে?

নির্ম্মল তাহার মুখখানি উঁচু করিয়া উত্তর দিল,—একটি ভালো ছেলের লেখাপড়া শেখবার পথ বন্ধ হ'যে যাচ্ছে, বাবা। আমি এই টাকা দিয়ে সেই পথটা খুলে দেব। বাইসিকেল চ'ড়ে না-ই বা পথ চললুম, আমার যখন পা আছে!

ছেলের এই উত্তর অনুকূল বাবুকে অধিকতর বিস্মিত করিয়া দিল। তিনি দুই চক্ষুতে প্রশ্ন ভরিয়া ছেলের মুখের দিকে পুনরায় চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখের কথা বাহির হইবার আগেই নির্ম্মল কহিল,—কথাটা আমি খুলে বলছি, বাবা! আপনি সব শুনলে কখনই স্থির থাকতে পরবেন না, কেঁদে ফেলবেন।

বাবা কাঁদুন, আর নাই কাঁদুন, কথার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিল। অনুকূল বাবু অবাক! এমন কি কথা আছে, যাহার সঙ্গে চোখের জলের ঘনিষ্ঠতা এত নিবিড়, এমন মাখামাখি!

নির্ম্মল তখন তাহাদের সহপাঠী আকবর আলির কথা ও কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে কেমন ভালো ছেলে, স্বভাবটি তাহার কেমন সুন্দর, কত ভাব তাহার সঙ্গে, কি বিপদ তাহাদের চলিয়াছে এবং তাহাতে তাহার শিক্ষার দ্বারে কত বড় বাধাই না পড়িয়াছে! একটি একটি করিয়া সমস্ত কথাই সে তাহার পিতাকে শুনাইয়া দিল।

মনের ভাব মনেই চাপিয়া রাখিয়া অনুকূল বাবু কহিলেন,—এই টাকা যদি সত্যিই তোমাকে দিই, কি ক'রবে তুমি? একটা মিটিং ক'রে সব ছেলেকে ডেকে তাদের সামনে আকবর আলির হাতে দেবে বোধ হয়?

কথাটা শুনিয়াই নির্ম্মলের চোখ দুটির উপর আকবরের মুখখানি ভাসিয়া উঠিল, চাঁদার কথা তুলিতেই তাহার মুখখানিতে কি কালিমার সঞ্চারই না হইয়াছিল! নির্ম্মল কহিল, না বাবা, তা হ'লে আকবর সে টাকা ছোঁবে না; গরীব হলেও সে ভিখারী নয়। আপনি যদি সত্যই রাজী হন, বাবা, টাকা আমি হাতে ক'রে নেব না, আপনি নিজেই এমন ক'রে স্কুলে তার নামে জমা দেবেন, যেন কেউ দিয়েছে, ছেলেদের ভেতরে সেটা জানাজানি না হয়। সে এদিকে বড্ডো অভিমানী যে!

অনুকুল বাবু কহিলেন,—আমি আজই তোমাকে কথা কিছু দিতে পারছি না। তবে তুমি ছেলেটির নাম, তার বাপের নাম, ঠিকানা, এগুলো সব লিখে ওবেলা আমাকে দিয়ো, আমি চেষ্টা ক'রে দেখবো কি ক'রতে পারি।

তিন

আজই শেষ দিন। আজও আকবর আলি স্কুলের পাওনা টাকাগুলি জোগাড় করিতে পারে নাই। আজই তাহার এই স্কুলে আসিবার ও ক্লাসের বেঞ্চিতে বসিবার শেষ তারিখ। ইহার পর পরীক্ষার পড়া তৈয়ার করিবার জন্য স্কুল সাত দিন বন্ধ থাকিবে, তাহার পরই পরীক্ষা সুরু হইবে।

দুরু দুরু বক্ষে আকবর ক্লাসে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া ছিল। শিক্ষক মহাশয় রেজিষ্টারী বহিখানি হাতে করিয়া ক্লাসে ঢুকিলেন, ছেলেরা এক সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিবাদন করিল।

চেয়ারে বসিয়াই তিনি ছাত্রদের নাম ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

—নির্ম্মলচন্দ্র মুখার্জ্জী?

—প্রেজেণ্ট স্যার।

—পরিতোষচন্দ্র সমাদ্দার?

—প্রেজেণ্ট স্যার।

—নবীনচন্দ্র দে?

—প্রেজেণ্ট স্যার।

—আকবর আলি মোল্লা?

এই নাম শিক্ষকের মুখে উঠিবামাত্রই ক্লাসের ভিতর একটা গুঞ্জন

উঠিল। যাহার নাম, তাহার মুখখানা এক মুহূর্ত্তে যেন কালো হইয়া গেল! সে বুঝিল, স্যারের মস্ত ভুল হইয়াছে। মাসের আজ প্রথম দিন; নূতন পাতায় ভুলিয়া তাহার নামটাও তোলা হইয়াছে।

শিক্ষক মহাশয় কণ্ঠে একটু বেশী জোর দিয়া আবার ডাকিলেন, আকবর আলি মোল্লা?

কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধরাগলায় আকবর আলি মোল্লা উত্তর দিল,—প্রেজেণ্ট, স্যার!

কিন্তু তাহার পরই সে প্রতিবাদের সুরে কহিল, আপনার ভুল হ'য়েছে, স্যার আমার নাম যে কাটা—

স্যার কহিলেন,—না; তোমার নাম উঠেছে। সীট ডাউন প্লীজ।

আবার তিনি সুরু করিলেন,—পতিতপাবন চক্রবর্ত্তী?—ইত্যাদি।

নাম রেজিষ্টারী হইবার পরেই স্বয়ং হেডমাষ্টার ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ক্লাস-টিচারের সহিত ক্লাসের সকল ছাত্রই একযোগে দাঁড়াইয়া উঠিল।

হেডমাষ্টার মহাশয় গম্ভীরভাবে কহিলেন—আকবর আলি মোল্লা,—স্কুল-কমিটী তোমার বাবার বিপদের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত। কমিটী তোমার পড়াশুনা ও স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত ক'রে সন্তুষ্ট হ'য়ে স্থির ক'রেছেন যে, তোমার বাবার অবস্থা পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত বিনা বেতনেই তুমি বরাবর স্কুলে পড়বে, আর তোমার কাছে পাওনা পেছলি টাকার আদায়ও মুলতুবি থাকবে। তোমার বাবা যদি আবার উপায়ক্ষম হন, কিম্বা ভবিষ্যতে তুমি নিজে লেখাপড়া শিখে মানুষ যদি হ'তে পারো, কমিটীর বিশ্বাস, স্কুলের ঋণ তোমরা নিশ্চয়ই পরিশোধ ক'রবে। তোমার বাবাকেও আলাদা চিঠিতে একথা জানানো হ'য়েছে।

ক্লাসের প্রায় সকল ছেলের মুখই তখন আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে;

বিশেষতঃ পরিতোষ ও নবীন অতি উল্লাসে একটা চীৎকার তুলিয়াই বসিল। আর নির্ম্মল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু গণ্ডের উপর ঝরিতেছিল; কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কি কেহ জানিতে পারিয়াছিল, দুস্থ সহপাঠীর এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের মূলে কে?

দুই হাত যুক্ত করিয়া আকবর আলি সম্মানভাজন শিক্ষকদ্বয়কে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়া তাহার সহপাঠীদিগের দিকে ফিরিল, তখনও তাহার দুইখানি হাত যুক্ত, দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত, মুখে একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি। সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে মাথাটি নত করিয়া সে তাহার স্থানটিতে বসিল।

চার

স্কুলের ঋণ পরিশোধ করিবার বা ক্লাসের মাহিনা দিবার মত অবস্থা আকবরের বাবার জীবনে পরবর্ত্তী দুইটি বৎসরের ভিতরেও আসিল না। অগত্যা আকবরের নামটি বরাবর বিনা বেতনে পড়ুয়া ছেলেদের তালিকাতেই রহিয়া গেল এবং এই অবস্থাতেই সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল।

পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আকবরদের অবস্থা আশ্চর্য্য রকমেই বদলাইয়া গেল; শুধু টাকার দিক্ দিয়া নহে—তাহার সহিত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার যোগাযোগ যথেষ্টই ছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় আকবর তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তি ত পাইলই, তাহা ছাড়া পাইল একটা সোনার মেডেল এবং পাঁচ শত টাকার একটা থলি। এই মেডেল ও টাকার থলি জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও বনেদী ভূস্বামী নবাব আসরফ আলি খাঁ বাহাদুরের প্রদত্ত। নবাব বাহাদুর ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জিলার মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে মুসলমান-ছাত্র প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে,

উক্ত স্বর্ণপদক ও টাকা তিনি তাহাকে খেলাত দিবেন। আকবরের সৌভাগ্যক্রমে সে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম দশ জন ছাত্রের' মধ্যে মুসলমান-ছাত্র হিসাবে সে একাই স্থান পায় এবং তাহার এই সাফল্যই তাহাকে অবশেষে নবাব বাহাদুরের জামাতার মর্য্যাদার সহিত তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার সূচনা করিয়া দেয়।

বিবাহের পরেই নবাব বাহাদুর কলিকাতায় বাসার ব্যবস্থা করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে জামাতার পড়া-শুনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর দেশের স্কুল, স্কুলের সহপাঠী ও জন্মভূমির সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াই গেল। বিবাহের সময়েও সে তাহার সহপাঠীদিগকে স্মরণ করিবার অবসর পায় নাই বা বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার হাতে পুরস্কারের অতগুলি টাকা আসা সত্ত্বেও সে বছর দুই পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের সেই বিশেষ নির্দ্দেশটুকুও স্মরণ রাখিতে পারে নাই।

আকবরের বাবা বরং সে সময় বলিয়াছিলেন,—আমি বলি কি, অতগুলো টাকা যখন মুফ্‌তো এলো, ও-থেকে অন্ততঃ গোটা পঁচিশ টাকা স্কুলে দিয়ে আয়।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আকবরের মাহিনার দেনা মাফ করিয়া ও তাহাকে বিনা বেতনে পড়িবার অনুমতি দিয়া যে-পত্র স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ এই নিরুপায় বৃদ্ধকে লিখিয়াছিলেন, ছেলে ভুলিলেও তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই। পত্রের শেষে ভবিষ্যতের যে নির্দ্দেশটুকু ছিল, তাহাও দুস্থ পিতাকে বুঝি সর্ব্বদা সচেতন করিয়া রাখিত।

কিন্তু ছেলে তাহাতে মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিয়াছিল,—কি দরকার! কত ছেলেই ত ফ্রী পড়ে, তাতে কি হ'য়েছে! সে টাকা ত আর কেউ নিজের পকেট থেকে দেয় নি!

তখনও বৃদ্ধের চারিদিকে দেনা, বহু পাওনাদার। সংসারের অবস্থাও

স্বচ্ছল নয় এবং নবাব বাহাদুরের বৈবাহিক হইবার সম্ভাবনাও তখন পর্য্যন্ত স্থচিত হয় নাই। সুতরাং চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া ও ছেলের মনোভাব বুঝিয়া তিনিও আর ইহার উপর কোনরূপ জোর দেন নাই। তাহার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাদের অবস্থা যখন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, নবাব বাহাদুরের সুব্যবস্থায় এই পরিবারটি পল্লীর পর্ণকুটীর হইতে জিলার সদরে এক মনোরম অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন; অতীতের সকল স্মৃতিচিহ্নই তখন পিছনে পড়িয়া রহিল; দুর্দ্দিনে ছিল যাহারা পরম বন্ধু ও সহায়, পল্লীর যে উচ্চ বিদ্যালয়টির সদয় ব্যবস্থাতেই এই সুখী পরিবারটির সৌভাগ্যের ভিত্তি রচিত হয়, তাহারাও সেই সঙ্গে কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। আকবরের চিত্তমুকুরে তাহাদের কোন প্রতিবিম্ব কোন দিন পড়িয়াছিল, এমন কোন নিদর্শনও পাওয়া যায় নাই।

পাঁচ

ইহার পর সতেরোটি বৎসর অতীত হইয়াছে। সকল দিক্ দিয়া আরও কত পরিবর্ত্তনই আজ অতীতের প্রত্যক্ষদর্শীদিগকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া দিয়াছে।

যে গ্রাম ও গ্রাম্য বিদ্যালয়টিকে উপলক্ষ করিয়া আমরা এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করি, দীর্ঘ সতেরো বৎসরে কালের কতরূপ প্রবাহই তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে!

যে অংশটি ছিল সমৃদ্ধ, অধিবাসীদের অবস্থা স্বচ্ছলতার পরিচয় দিত, বড় বড় অট্টালিকা গগন ভেদ করিয়া মাথা তুলিয়া এই অঞ্চলটির সৌভাগ্য ঘোষণা করিত, আজ যেন সে সকলই শ্রীভ্রষ্ট, কদর্য্য। রাস্তাগুলির সে

পারিপাট্য নাই, অধিকাংশ বাড়ী পরিত্যক্ত, কোনটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, দেওয়ালের ফাটল দিয়া বড় বড় আগাছা উঠিয়াছে, চারিদিকে বন-জঙ্গল জন্মিয়াছে, কৃতী অধিবাসীরা সহরবাসী, বাড়ীর পরিচর্য্যা করিতে কেহ নাই। যে সব বাড়ীতে এখনও মানুষ আছে, তাহারা কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকে এই পর্য্যন্ত। উপার্জ্জন তাহাদের এত অল্প এবং পোষ্যের সংখ্যা এত অধিক যে, দুই বেলা অন্নসংস্থানও তাহাতে হইয়া উঠে না, বাড়ী-ঘরের সংস্কার করিবার সাধ্য কোথায়?

পূর্ব্বপরিচিত পুরাতন হাই স্কুলটির অবস্থাও পুরাতন গ্রাম্য সহরটির অধিবাসীদের মতই জরাশীর্ণ ও নিতান্ত শোচনীয়। ছাত্রসংখ্যা বিগত সতেরো বৎসরের ভিতর বিশেষ বাড়ে নাই, কিন্তু ব্যয়ের হার নানা সূত্রে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সতেরো বৎসর পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়টির কর্ত্তৃপক্ষদের যে কমিটী ছিল, তাহার অস্তিত্ব আজ নাই। তাহার পর কত কমিটীই পর পর গঠিত হইয়া কর্ত্তৃত্বের ভার লইয়াছে, কিন্তু এই শিক্ষায়তনটির উন্নতির কোন ব্যবস্থাই কোন কমিটী এ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। পুরাতন শিক্ষকদের মধ্যে অতীতের সাক্ষ্য দিতে আর কেহই নাই, শুধু আছেন এক মাত্র হেডপণ্ডিত বিধুভূষণ বিদ্যারত্ন মহাশয়।

গোড়া হইতেই এই স্কুলটির স্বতন্ত্র কেরাণী ছিল না; বোঝার উপর শাকের আটির মত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উপরেই কেরাণীর কাযটি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য ইহার বিনিময়ে তিনি বিদ্যালয়-সংলগ্ন বাস-বাড়ীটি বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন।

প্রায় সাতাশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বিদ্যালয়ে হেডপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন এবং এ পর্য্যন্ত একই ভাবে এই পদে বাহাল আছেন। শুধু ইহাই নহে, শিক্ষকদিগের প্রতিনিধি হিসাবে কমিটীর

মধ্যেও ইনি স্থান পাইয়াছেন ; এদিক্ দিয়াও ইনিই একাদিক্রমে দীর্ঘকাল কমিটীর স্থায়ী সদস্যের গর্ব্ব করিতে পারেন।

এই সতেরো বৎসরে আকবর আলির পরবর্ত্তী জীবনের গতিও বিস্ময়কর। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করে। নবাব বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে তাহাকে বার-এ প্রবেশ করিতে হয়। এখন আকবর আলি জেলার উকীল সরকার; কাউন্সিলের মেম্বার, তাহার প্রচুর আয়, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অপরিমেয়। সম্প্রতি সরকার বাহাদুর খাঁ-বাহাদুর উপাধি দিয়া অনরেবল্ আকবর আলিকে সম্মানিত করিয়াছেন। জেলার সদরে রেলওয়ে ষ্টেশনের সান্নিধ্যেই উকীল সরকার খাঁ-বাহাদুর আকবর আলির প্রাসাদতুল্য বিশাল অট্টালিকা সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান স্কুল-কমিটীর বহু সাধ্য-সাধনার পর খাঁ-বাহাদুর আকবর আলি এবার স্কুলের প্রেসিডেণ্টের পদটি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে স্কুলের হিতৈষীমহলে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নামজাদা প্রেসিডেণ্টের সদয় দৃষ্টি যদি এই মুমূর্ষু স্কুলটির উপর পড়ে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং পুনরায় চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। তাঁহারা সাগ্রহেই সেই সদয় দৃষ্টি-বিন্দুটুকুর প্রতীক্ষায় উদগ্র হইয়া রহিলেন —কবে বর্ষণ হয়।

সপ্তাহখানেক পরেই নূতন প্রেসিডেণ্টের এক পত্র আসিয়া উপস্থিত। লেফাফাখানি দেখিয়াই প্রেসিডেণ্টের প্রতি আস্থাশীল সদস্যদের মুখে হাসি আর ধরে না। কিন্তু খুলিয়া চিঠিখানা পড়িতেই তাঁহাদের মুখগুলি অন্ধকার হইয়া গেল। প্রেসিডেণ্ট সেই পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

তাঁহার নির্দ্দেশ লইয়া কমিটীর প্রত্যেক মিটিং বসিবে। মিটিংএর

'অ্যাজেণ্ডা' তিনি দেখিয়া দিবেন। মিটিং হইয়া গেলে তাহার রিপোর্ট-বহি, তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে। তাঁহার মঞ্জুরী ভিন্ন স্কুলের কোনও অদল-বদল হইবে না—কাহাকেও বাহাল-বরতরফও নয়।

চিঠি পড়িয়াই সকলের চক্ষুস্থির! প্রেসিডেণ্ট চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন বাড়ীতে, কালেভদ্রে কদাপি স্কুলে দেখা দিতে আসেন; কমিটীর ব্যবস্থার উপর কোন কথাই তিনি কহেন না, চোখ বুজাইয়া খাতায় সহি করিয়া দেন। বাহাল-বরতরফ ত কমিটীই বরাবর করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং প্রেসিডেণ্টের এরূপ নির্দ্দেশে চক্ষু ত কপালে উঠিবারই কথা! কিন্তু উপায় নাই, খাল কাটিয়া তাঁহারাই কুমীরকে ডাকিয়া আনিয়াছেন, এখন তাহাকে ফিরাইবার সাধ্য কোথায়?

আস্থাশীলের দল বলিলেন,—ও অমন লেখে, গোড়ায় একটু নেড়ে চেড়ে দেখবে, তার পরেই ঘুমোবে দেখো, টুঁ শব্দটিও আর করবে না।

ইহার কিছুদিন পরেই স্কুলের সেকেণ্ড-মাষ্টারের পদ খালি হইল। যিনি এই পদে কায করিতেছিলেন, বাঙ্গালা সরকারের সেক্রেটেরিয়েটে একটা বড় রকমের চাকরী পাইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হইল এবং এ সম্বন্ধে কমিটীর মিটিং বসিবার পূর্ব্বেই হেডপণ্ডিত মহাশয় কমিটীর সভ্যগণকে জানাইলেন যে, এই গ্রামেই এক জন উপযুক্ত লোক আছেন, তিনি ম্যাথ্‌মেটিক্সে এম-এ, বি-এতেও অঙ্কে অনার্স নিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাসে পাস করেন। তা ছাড়া এই স্কুল হইতেই তিনি ম্যাট্রিক দেন, সে হিসেবে এখানকার তিনি পুরাতন ছাত্র এবং এই পদে তাঁহারই দাবী অগ্রগণ্য। একখানা দরখাস্ত তিনি আগেই দিয়া রাখিয়াছেন—যদি কোনো পোষ্ট খালি হয় তাহার জন্য।

ইহা ব্যতীত ছেলেটির সম্বন্ধে অনেক ঘরোয়া কথা বলিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার অনুকূলে জোর সুপারিশই করিলেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবটি কমিটীর অধিকাংশ সদস্যের চিত্তস্পর্শ করিলেও তাঁহারা প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশটুকু তুলিয়া কহিলেন,—জানেন ত, বাহাল বরতরফের কর্ত্তা এখন তিনিই, এ ব্যাপারে কমিটীর কোনো জোর এখন নেই।

পণ্ডিত মহাশয় দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—কমিটীর জোর নেই, এ কথা আমি স্বীকার ক'রতে পারছি না। যেটা ঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত, তার দিকে ন্যায়নিষ্ঠমাত্রেরই মত দেওয়া উচিত। কমিটীর সব সদস্যই যদি একমত হন, প্রেসিডেণ্টের আপত্তিতেও কিছু আসে যাবে না।

সদস্যগণ কহিলেন,—কিন্তু তিনি তাতে চটে যাবেন, আর আমাদের আসল উদ্দেশ্যটাই পণ্ড হবে। এখন ও লোকটাকে চটানো মানেই, ইস্কুলটার দফা রফা হবার পথ পরিষ্কার ক'রে দেওয়া। অনিষ্টের ক্ষমতা ওঁর যথেষ্ট আছে। আমরা তা চাই না। অন্ততঃ একটা বছর নির্ব্বিচারেই আমরা প্রেসিডেণ্টের সমস্ত নির্দ্দেশই মাত্রায় মাত্রায় মেনে চ'লবো, এটা স্থির। হ্যাঁ, তবে এ ব্যাপারে আমরা তাঁকে সুপারিশ ক'রব—যাতে এই উপযুক্ত প্রার্থীটিকে এই স্কুলেরই এক্স-ষ্টুডেণ্ট হিসেবেও তিনি বাহাল ক'রবার মঞ্জুরী দেন। আর তিনিও ত এই স্কুলেরই এক জন এক্স-ষ্টুডেণ্ট।

ছয়

প্রার্থীর আবেদন-পত্রের সহিত কলিকাতার কোন বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসাপত্রও ছিল। আবেদনে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, পারিবারিক ঘটনা-পরম্পরা তাঁহাকে স্বগ্রামে থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। ভবিষ্যতের সকল আকাঙ্ক্ষা ও প্রলোভন ত্যাগ করিয়াই

তিনি এই পদের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন এবং স্বগ্রামের এই প্রিয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির সংস্রবেই তিনি তাঁহার সমস্ত উদ্যম ও জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছুক।

এই আবেদনপত্রের সহিত কমিটীর সকল সদস্য, সম্পাদক এবং হেডমাষ্টারের যথাবিহিত সুপারিশও ছিল—যাহাতে প্রেসিডেণ্ট প্রার্থীকেই নিয়োগ করিবার মঞ্জুরী দেন।

যে লোক এই 'ডেসপ্যাচ' লইয়া প্রেসিডেণ্টের বাড়ীতে গিয়াছিল, যথাসময়ে সে তাঁহার উত্তর লইয়া ফিরিল। ছোট একখানি চিঠিতে গুটিকয়েক ছত্রে প্রেসিডেণ্ট তাঁহার সংক্ষিপ্ত 'আদেশ' জানাইয়াছিলেন। ছোট হইলেও চিঠিখানার ঝাঁঝ ঠিক ধানিলঙ্কার মত, কোন অংশই অসার বা নিরর্থক নহে। চিঠিখানির মর্ম্ম এইরূপ—

স্কুলের চৌদ্দজন শিক্ষকের মধ্যে এক জন মৌলভি ভিন্ন আর সকলেই হিন্দু। দ্বিতীয় শিক্ষকের যে পদটি খালি হইয়াছে, তাহাতে এক জন উপযুক্ত মুসলমানকে নিয়োগ করা হইবে এবং সে ব্যবস্থা তিনিই করিবেন।

প্রেসিডেণ্টের এই নির্দ্দেশ কমিটীর সদস্যদিগকে পুনরায় চমকিত করিয়া দিল মাত্র, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। বেত্রাহতের মতই তাঁহারা সমস্ত ত্রুটি নিজেদের উপর লইয়া অনুশোচনার সুরে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—কথাটা কিন্তু ঠিক, দোষ আমাদেরই।

শুধু পণ্ডিত মহাশয় প্রতিবাদ তুলিলেন,—দোষ আমাদের অদৃষ্টের, আর সেটা ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার দিক্ দিয়ে। আমার মনে হয় যখনই বুঝব যে, কাযে দোষ হ'য়েছে, তখনই উচিত—সে কায থেকে সরে যাওয়া।

প্রশ্ন হইল,—আপনি কি ব'লতে চান?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—আমি ব'লতে চাই, এ পর্য্যন্ত কাযে আমাদের দোষ হয় নি, তবে অতঃপর যে হবে তারই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

—কি সূত্রে এ কথা ব'লছেন ?

—পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সূত্রেই কথাটা ব'লতে হ'চ্ছে। এই স্কুলে এখন ছাত্রসংখ্যা মোট তিনশ তেইশ ; তার মধ্যে মুসলমান-ছেলে আছে মোটে পনের জন। কোনো ক্লাসে তিনটি, কোনো ক্লাসে দুটি, আবার কোনো ক্লাসে একেবারেই নেই। তথাপি ত্রিশ টাকা মাইনে আর বাসা-খরচ অতিরিক্ত সাত টাকা দিয়ে বাইরের এক জন মৌলভিকে আনতে হ'য়েছে। এই স্কুলের মাষ্টারদের মাইনে অন্যান্য স্কুলের তুলনায় অনেক কম ; তার কারণ এই যে, প্রায় সব মাষ্টারই এই অঞ্চলের ; খাঁই এদের অল্প এবং স্কুলের ওপর একটা দরদ আছে। যতই দুর্দ্দশা এই গ্রামের হোক, এখনো এই একখানা গ্রাম থেকেই পঞ্চাশটি গ্রাজুয়েট জড় করা যায়, কিন্তু আশে-পাশের দশখানা গ্রাম জড়িয়ে তাদের ভেতর থেকে অন্ততঃ তিন জন মুসলমান-গ্রাজুয়েট আপনারা যোগাড় করতে পারেন ? তবুও ব'লবেন, ত্রুটি আমাদেরই ?

কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের এই উক্তি সদস্যদের অন্তর স্পর্শ করিলেও তাঁহারা প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশেই জোর দিয়া কহিলেন,—ন্যায় ও নিরপেক্ষতার দিক্ দিয়ে ভেবে দেখলে, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রেসিডেণ্টের যুক্তিটাও অকাট্য।

সেবার সদস্যদের মন্তব্য শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিয়াছিলেন, এবার শুধু একটু হাসিলেন। কিন্তু সে হাসির অর্থ কমিটীর কোন সদস্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন কি ?

তৃতীয় দিনে ইঁহারা সকলেই সবিস্ময়ে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলেন—

অঙ্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন গ্রাজুয়েট অথবা এম, এ, শিক্ষক আবশ্যক। আবেদনকারী অবশ্যই মুসলমান হইবেন। বেতন আপাততঃ পঞ্চাশ টাকা; আহার ও বাসা আলাদা পাইবেন। সত্বর প্রেসিডেণ্টের নিকট নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

প্রেসিডেণ্টের নামটির নীচে তাঁহারই বাড়ীর ঠিকানা দেখা গেল। আবার কমিটীর ঘরোয়া মিটিং বসিল। প্রেসিডেণ্টের এই ডিক্টেটরী-তাণ্ডবের মধ্যেও তাঁহারা শৃঙ্খলা ও আন্তরিকতার প্রচুর আভাস পাইলেন; পূর্ব্বের বিস্ময় আর বিক্ষোভ তুলিবার অবসর পাইল না। যেহেতু, প্রেসিডেণ্টের কর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রখরতা এতই তীব্র যে, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া নিজেই খবরের কাগজে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দিয়াছেন? ইহাকেই বলে কাযের লোক, এমন না হইলে প্রেসিডেণ্ট!

কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এবারও একটা বিষয়ে প্রতিবাদ তুলিলেন,—পদটির মাইনে অবশ্য পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু তার সঙ্গে আহার-বাসার কোন সম্বন্ধ নেই। প্রেসিডেণ্ট যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাতে বোঝাচ্ছে, মাইনে পঞ্চাশ টাকার ওপর আহার ও বাসা তাঁকে ফ্রী দেওয়া হবে। তার মানে, আরো অন্ততঃ পনেরো টাকার ধাক্কা। সে টাকা কে দেবে?

উত্তরে সদস্যগণ কহিলেন,—যার লাঠি তার বোঝা। বুঝতে পারছেন না, প্রেসিডেণ্ট নিজেই সে ভারটা নেবেন। আমাদের এ নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার কি দরকার?

পণ্ডিত মহাশয় নীরবে শুধু হাসিলেন মাত্র।

ইহার সাত দিন পরে প্রেসিডেণ্টের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক পত্র আসিল।—

অনেকগুলি আবেদন-পত্র আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকেই আমি ডাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আগামী ১লা নভেম্বর ছুটী

আছে। ঐ দিন বেলা দুই ঘটিকার সময় স্কুল-রুমে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করিবেন, যথাসময়ে আমিও উপস্থিত হইব।

পল্লীর কৃতবিদ্য দুঃস্থ প্রার্থীটির আশাভঙ্গে হয় ত কমিটীর কতিপয় সদস্যের অন্তরে বেদনার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু মহামান্য প্রেসিডেণ্টের উপস্থিতির আনন্দে তাহা বুঝি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

সাত

অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত পহেলা নভেম্বর দেখা দিল। এবার এই দিনে জগদ্ধাত্রী পূজা পড়ায় আফিস, আদালত, স্কুল প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ ছিল।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দুইটার সময় প্রেসিডেণ্টের সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ মোটরখানি বিদ্যালয়ের হাতার সম্মুখে আসিয়া থামিল। ভক্তবৃন্দ প্রস্তুত ছিলেন; বিপুল শ্রদ্ধার সহিত এই সম্মানভাজন মানুষটিকে অভ্যর্থনা করিয়া সুসজ্জিত হলটির ভিতর লইয়া গেলেন।

সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘাকৃতি, দিব্য সুপুরুষ; মুখের দিকে কিন্তু চাহিলেই মনে হয় মানুষটি অতিশয় গম্ভীর ও দাম্ভিক, ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটু ঝিলিকও ফুটিয়া উঠে নাই। অথচ, তাঁহার আচরণে শিষ্টাচারের অভাব আছে, এমন কথা বলাও কঠিন। স্বল্পভাষী হইলেও প্রতি কথাটি তাঁহার মার্জ্জিত ও দৃঢ়। ওদিকে তাঁহার গাড়ীর সোফার ও সঙ্গে আরদালীর পোষাক-পরিচ্ছদে প্রচুর পারিপাট্য থাকিলেও, তাঁহার সাজসজ্জা খুবই সাধারণ। সচরাচর মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক যেরূপ কাপড়, জামা ও চাদর ব্যবহার করেন, তাহার অতিরিক্ত কিছুই নাই, এমন কি, মাথাটি পর্য্যন্ত খালি,

তাহাতে টুপি দেখা গেল না ; মুখখানাও রীতিমত ক্ষৌরিত, গোঁফদাড়ির কোন চিহ্নই নাই।

স্কুলের কমিটীর সেক্রেটারী মুদ্রিত অভিনন্দনটি পাঠ করিলেন। অভিনন্দন-পত্রে বিশেষ করিয়া এইটুকু উল্লেখ ছিল যে, যাঁহাকে আজ তাঁহারা অভিনন্দিত করিতেছেন, যিনি আজ নানা সূত্রে বাঙ্গালা দেশের এক কৃতী সন্তান, এই জিলার অধিবাসীদের মুখ যিনি উজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার দ্যুতি বিকীর্ণ করিয়া,—তিনি এই বিদ্যালয়েরই এক সুপ্রশংসিত ছাত্র এবং এই বিদ্যালয় হইতেই তিনি সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অতিক্রম করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, যাঁহারা ছিলেন সে সময় তাঁহার সহপাঠী, এই অভ্যর্থনা সভায় যোগ দিবার সৌভাগ্য হইতে অদৃষ্ট তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। তাঁহাদের কেহ কেহ মৃত, কেহ বা জীবন্মৃত, অনেকে দেশান্তরিত। অতীতের সাক্ষীস্বরূপ এই বিদ্যামন্দিরটি আজ তাঁহাকেই পুনরায় অভিভাবক স্বরূপ পাইয়া ধন্য হইয়াছে—ইত্যাদি।

প্রেসিডেণ্ট গুটিকয়েক কথায় এই সুদীর্ঘ অভিনন্দন পত্রের উত্তব দিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। তিনি যে এই বিদ্যালযের ছাত্র ছিলেন এবং দীর্ঘকাল পরে পুনরায় ইহার সংস্পর্শে আসায় অতীতের অনেক কথাই তাঁহার মানসপটে ছবির মত ফুটিয়া উঠিতেছে—এ কথা তিনিও উল্লেখ করিলেন তাঁহার স্বল্প বক্তৃতায়।

অভ্যর্থনা সভার পর সুরু হইল কমিটীর সভা। আলোচ্য বিষয় উঠিতেই প্রেসিডেণ্ট একখানি আবেদনপত্র সেক্রেটারীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন,—এঁর কথাই আমি লিখেছিলুম, ঐ পোষ্টে ইনিই কায ক'রবেন। আপনাদের আপত্তি আছে ?

ইতিমধ্যেই আবেদনপত্রখানা সদস্যগণের হাতে হাতে ঘুরিয়া শেষ

হেডমাষ্টারের হাতে গেল। তিনি কহিলেন,—ইনি দেখছি পাসকোর্শেই বি, এ পাস ক'রেছেন, আর প্রাইভেটে এম, এ পড়ছেন,—পাস এখনো করেন নি।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—হ্যাঁ। কিন্তু বি-এতে ওঁর কমবিনেসনে ম্যাথ্‌মেটিক্সও ছিল। আর, এম-এ-র জন্য ম্যাথ্‌মেটিক্স নিয়েই উনি প্রস্তুত হ'চ্ছেন। এই সব দেখেই আমি ওঁকে 'সিলেক্ট' ক'রেছি।

হেডমাষ্টার কহিলেন,—কিন্তু ইনি যে ম্যাথ্‌মেটিক্সে এক্সপার্ট, ওঁর কথা ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে তা জানবার উপায় নেই। কোনো স্কুলে সেকেণ্ড-মাষ্টারের পোষ্টে কায ক'রেছেন, এমন কোন সার্টিফিকেটও দেন নি।

হেডমাষ্টারের সহিত প্রেসিডেণ্ট পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছিলেন। হেডমাষ্টারের এই মন্তব্যের উত্তরে তিনি সহসা প্রশ্ন করিলেন,—আপনার কোয়ালিফিকেসন জানতে পারি?

হেডমাষ্টার উত্তর দিলেন,—নিশ্চয়ই। ইংলিসে অনার্শ নিয়ে আমি বি-এ পাশ করি, এম-এতেও ঐ কোয়ালিফিকেসন আমার।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—বেশ। এখন আপনিই বলুন ত, যদি প্রয়োজন পড়ে, ফার্ষ্ট ক্লাসের ছেলেদের আপনি কি ম্যাথ্‌মেটিক্স পড়াতে পারেন না?

হেডমাষ্টার উত্তরে কহিলেন,—প্রয়োজনের কথা আলাদা। প্রয়োজন হ'লে শুধু ম্যাথ্‌মেটিক্স কেন, পণ্ডিত মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে ওঁর পিরিয়ডেও একদিন সংস্কৃত পড়িয়ে ক্লাসের 'ডিসিপ্লিনটা' হয় ত বজায় রাখতে পারি। কিন্তু যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং যার জন্য সুরু থেকে তিনি সাধনা ক'রেছেন, সে বিষয়ে শিক্ষা দেবার দাবী তাঁরই। কেউ যদি অঙ্কে অভিজ্ঞ একজন বহুদর্শী গ্রাজুয়েট চান, ডবল এম-এ হ'লেও, আমি নিশ্চয়ই সেখানে প্রার্থী হবার স্পর্দ্ধা ক'রব না।

প্রেসিডেণ্টের মুখখানা এক নিমেষে কালো হইয়া গেল। এই সময় হেড-পণ্ডিত মহাশয় একখানা ভাঁজ করা কাগজ প্রেসিডেণ্টের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিলেন,—আর এই দরখাস্তখানাও দেখুন, অঙ্কে অনার্শ নিয়ে ছেলেটি বি, এ, পাশ ক'রেছে, এম, এতেও তাই; অঙ্ক নিয়েই ওর সাধনা। কলিকাতার মিত্র ইনষ্টিটিউসনে সেকেণ্ড-মাষ্টারের পোষ্টে চাকরীও ক'রেছে বছর খানেক। তারও খুব ভালো সার্টিফিকেট এর আছে।

প্রেসিডেণ্ট কাগজখানার উপর তাঁহার দুই চক্ষুর দৃষ্টি একবার বুলাইয়াই পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া অবজ্ঞার সুরে কহিলেন,—এ দরখাস্ত আমার দেখা আছে, কিন্তু এ নিয়ে ত কথা হ'চ্ছে না। আমাদের দরকার এখন—একজন মহামেডান টিচার; আমার বিচার-বিবেচনায় আমি এই দরখাস্তই মঞ্জুব ক'রেছি। আপনাদের আপত্তি থাকে, বাতিল ক'রতে পারেন।

কমিটীর অধিকাংশ সদস্যই হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিতের ধৃষ্টতায় অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন, এইবার তাঁহারা সুযোগ পাইলেন। ব্যগ্রভাবে ও বিনীত কণ্ঠে তাঁহারা জানাইলেন,—প্রেসিডেণ্টের কথার উপর আমাদের কোন কথা নাই, ঐ দরখাস্তই আমরা মঞ্জুর ক'রছি।

ইহার পরও পণ্ডিত মহাশয় নির্ব্বাচিত শিক্ষকটির আহার ও বাসার স্বতন্ত্র খরচ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া প্রেসিডেণ্টকে বিব্রত করিলেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট দমিলেন না, গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—তার জন্য আটকাবে না, সে ব্যবস্থা আমিই ক'রব।

অতঃপর প্রেসিডেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল ও তাঁহাকে জলযোগে আপ্যায়িত করিবার জন্য কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল।

জলযোগের পর প্রেসিডেণ্ট যখন উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন, পণ্ডিত

মহাশয় ঠিক সেই সময় তাঁহার কাছে গিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন,—আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা আছে, যদি দয়া ক'রে—

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—নিশ্চয়ই শুনব।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—তা হ'লে লাইব্রেরীর ঘরটায় একবার যেতে হবে। ওখানে এখন কেউ নেই।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—চলুন।

আট

ছোট ঘর। মাঝে একখানা ছোট টেবল, তাহাকে ঘিরিয়া কয়েকখানি চেয়ার; চারিদিকেই আলমারি, থাকগুলি পুস্তকে পূর্ণ।

একখানা চেয়ারে বসিয়াই প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—বলুন আপনার কথা।

পণ্ডিত মহাশয় ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে প্রেসিডেণ্টের সৌম্যগম্ভীর মুখখানার দিকে চাহিয়া সহসা অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন,—এখন আমরা কমিটির বাইরে, মনে ক'রতে হবে—আরো বিশ বছর আমরা পেছিয়ে গেছি। সেই হিসেবে এখন তুমি অনরেবলও নও, খাঁ বাহাদুরও নও, কমিটীর প্রেসিডেণ্টও নও, এখন তুমি শুধু আকবর আলি মোল্লা—এই স্কুলের থার্ড ক্লাসের ছাত্র, আর আমি—এখনো কি আমাকে চিনতে পার নি?

প্রেসিডেণ্ট তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন,—চিনতে পেরেছি, আপনি পণ্ডিত মশাই! কথার সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইটি যুক্ত করিয়া ও ললাটে ঠেকাইয়া তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। তাহার পর সবিনয়ে কহিলেন,—আপনি বসুন।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—ব'স, তুমি ব'স, আমি ব'সছি।

উভয়েই প্রায় মুখো-মুখি হইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব, কাহারও মুখে কোনো কথা যাই। পণ্ডিত মহাশয়ই সেই নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিলেন। যে দরখাস্তখানি ইতিপূর্ব্বে তিনি সভায় প্রেসিডেণ্টের হাতে দিযাছিলেন, সেইটিই এই রুদ্ধ কক্ষে প্রেসিডেণ্টের ঠিক মুখের সম্মুখে তুলিযা কহিলেন,—এই দরখাস্তখানা পরিমল মুখোপাধ্যায়ের। তুমি একে জান?

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—আমি কি ক'রে জানব? দরখাস্ত দেখে কি তার লেখাকেও জানা সম্ভব?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—তুমি একে জানো, দেখেছ তবে হয় ত মনে নেই। আচ্ছা নির্ম্মলকে তোমার মনে আছে?—তোমাদেরই ক্লাসে বরাবরই সে ছিল ফার্ষ্ট বয়,—নির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায! মনে আছে?

নির্ম্মলের নামেই প্রেসিডেণ্টের মুখে বিস্ময়ানন্দের কতিপয় রেখা বুঝি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—খুব আছে। কিন্তু তাব সম্বন্ধে কোন খবরই আর পাই না, সে-ও দেয় না।

—নির্ম্মলের সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি কোন্ সময থেকে মনে আছে?

—এক সঙ্গেই আমরা পরীক্ষা দিই তা বেশ মনে আছে। সেনেট হলেই আমাদের সীট পড়েছিল। নির্ম্মল সে সময় চোখের অসুখে খুব ভুগছিল, আমাকে রোজই ব'লত—মোটেই লিখ্‌তে পারিনি।

—পরীক্ষার পর আর বুঝি দেখা হয় নি?

—না। পরীক্ষার পর আমি মামার বাড়ী যাই, ফল বেরোবার পরে ফিরি। আমরা সবাই জানতুম, নির্ম্মল ম্যাট্রিকে য়ুনিভার্সিটির রেকর্ড ভাঙ্গবে। কিন্তু যখন শুনলুম, সে টায়েটুয়ে কোনরকমে পাস ক'রেছে, তখন আর লজ্জায় তার সঙ্গে দেখা করিনি। তার পরেই ঘটনাচক্রে আমাকেও দেশভূঁই ছাড়তে হয়।

—সে সমস্তই আমি শুনেছি। কিন্তু তার পর, নির্ম্মলদের অবস্থার কথা কি তুমি কিছুই শোননি ?

—না। কোন খবরই আমি আর পাই নি। কিন্তু আজ তাব সম্বন্ধে সব খবর জানবার জন্য আমার ভারি আগ্রহ হ'চ্ছে।

—শোনবার ধৈর্য্য তোমার হবে ?

—নিশ্চয়ই হবে, আপনি বলুন।

এতক্ষণ পরে পণ্ডিত মহাশয়ের গলা যেন ধরিয়া আসিল, স্বরও গাঢ় হইয়া বাহির হইল,—পরীক্ষার আগে থাকতেই নির্ম্মলের চোখে 'গ্লকোমা' হ'য়েছিল, যা কিছু সে লিখেছিল সবই আন্দাজে। তবুও সে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হ'য়েছিল এইটুকুই আশ্চর্য্য। তোমার যখন বিয়ের উৎসব খুব ঘটা ক'রে চলছিল, এখানে তখন নির্ম্মলের চোখের চিকিৎসাও বিপুল ঘটা ক'রেই হ'চ্ছিল। কিন্তু কোন ফল তাতে হ'ল না, নির্ম্মল জন্মের মত অন্ধ হ'য়ে গেল।

যেন একটা তীরের তীক্ষ্ণ ফলা আচম্বিতে প্রেসিডেণ্টের বুকে আসিয়া বিঁধিল। আর্ত্তস্বরে তিনি কহিয়া উঠিলেন,—অন্ধ হ'য়ে গেল! কী বলছেন, পণ্ডিত মশাই, নির্ম্মল অন্ধ ?

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—হাঁ, নির্ম্মল আজও অন্ধ ; পৃথিবীর আলো আর তার চোখে পড়েনি। কিন্তু এইখানেই ওদের দুর্ভাগ্যের শেষ নয়। এই সময় বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক হঠাৎ ফেল হ'য়ে যায়, নির্ম্মলের বাবার সারা জীবনের সঞ্চয় ঐ ব্যাঙ্কে জমা ছিল, এক দিনেই তিনি হ'লেন সর্ব্বহারা। সে টাল সামলাতে পারলেন না, কোর্ট থেকে ফিরেই হার্ট-ফেল ক'রে মারা গেলেন।

প্রেসিডেণ্ট অভিভূত হইয়া কহিলেন,—কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—দরখাস্তের এই পরিমল হ'চ্ছে নির্ম্মলের ছোট

ভাই। অন্ধ অবস্থায় নির্ম্মল তাকে জানালে, উচ্চশিক্ষা পাব—এই ছিল আমার জীবনের সাধ। তুমি উচ্চ শিক্ষিত হ'য়ে সে সাধ আমার পূর্ণ কর, ভাই! পরিমলও বললে, আমিও লেখাপড়া শিখবই, কিন্তু তুমিও লেখাপড়া ছাড়তে পারবে না, দাদা! অন্ধরাও আজকাল ত পড়াশুনা ক'রছে। সেই থেকে দুই ভায়ের পড়ার সাধনা চলে। জমিজেরাত যা কিছু ছিল, পরিমলের পড়ার খরচে সমস্তই শেষ হ'য়ে যায়। এখন ওদের মত দুঃখী ও অসহায় এ তল্লাটে বুঝি কেউ নেই।

প্রেসিডেণ্ট মুখখানা ম্লান করিয়া কহিলেন,—নির্ম্মলের কত আকাঙ্ক্ষাই ছিল, কত কথাই সে বলত তখন? উঃ, কি দুর্ভাগ্য!—কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশ্বাস তাঁহার নাসিকার রন্ধ্র দিয়া সবেগে বাহির হইয়া গেল।

পণ্ডিত মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং পরক্ষণে সহসা নিজের মনকে দৃঢ় করিয়া কহিলেন,—অনুচিত হ'লেও আজ আমি একটা কথা না ব'লে থাকতে পারছি না, হয় ত কথাটা তোমার পক্ষে অপ্রীতিকর হবে, কিন্তু সেটা কঠোর সত্য।

দুই চক্ষুতে প্রশ্ন ভরিয়া প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—সকল দিক্ দিয়ে এই যে তুমি আজ শ্রীবৃদ্ধির শিখরে উঠেছ, এর মূল কিন্তু এই নির্ম্মল! সে ইতিহাস তুমি জান?

পণ্ডিত মহাশয়ের এই কথাগুলি প্রেসিডেণ্টের বিষণ্ণ মুখখানার উপর হঠাৎ যেন আঘাতের মতই পড়িল, দেখিতে দেখিতে তাহা অপ্রসন্ন ও কঠিন হইয়া উঠিল। স্বরও একটু রুক্ষ করিয়া তিনি কহিলেন,—এইটুকুই জানি, পণ্ডিত মশাই, আমরা দু'জনেই পরস্পরের প্রতি খুব সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলুম। একের দুঃখে অন্যের দরদের অন্ত ছিল না। আমার বেশ মনে আছে, মাইনে পড়ে যাওয়ায় আমার যখন নাম কেটে দেওয়া হয়, আমি

একজামিন দিতে পারবনা জেনে, নির্ম্মল ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলেছিল। সহপাঠীর এই দরদকে, এই সহানুভূতিকে আপনি যদি আমার উন্নতির ভিত্তি বলে ধরে নিতে চান, আমার তাতে আপত্তি নেই।

পণ্ডিত মহাশয় কণ্ঠের স্বরে এবার একটু জোর দিয়াই কহিলেন,—শুধু এইটুকুই নয়, এর চেয়েও অনেক বেশী কিছু আছে, আমি ভিন্ন যে বিষয়-বস্তুটির সাক্ষী আর কেউ নেই। সেই কথাটাই আমি তোমাকে আজ জানিয়ে দিতে চাই, আর এটা তোমার পক্ষে জানাও উচিত।

বিস্ময়ের সহিত প্রচ্ছন্ন-বিদ্রূপের স্থরে প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—বলুন, পণ্ডিত মশাই বলুন, শুনতে আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে।

পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে একখানা অতি পুরাতন বাঁধানো খাতা ছিল। খাতাখানির নির্দ্দিষ্ট অংশটি খুলিয়া তিনি প্রেসিডেণ্টের সম্মুখে ধরিলেন।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—এ ত দেখছি স্কুল-কমিটির মিটিংএর একটা রিপোর্ট।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—হ্যাঁ, বছর কুড়ি আগে এই ঘরেই ঐ মিটিংটা ব'সেছিল। সেদিন যাঁরা যাঁরা মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাক্ষী দিতে আমি একাই এখনো বিদ্যমান আছি। ওর সঙ্গে যে চিঠিখানা পিন দিয়ে আঁটা আছে, আগে ওটা তোমাকে পড়তে হবে। চিঠিখানা লিখেছিল নির্ম্মলের বাবা, চিঠির ভেতরে ছিল দশ টাকার দুখানা নোট। ঐটে আসবার পরই মিটিং বসে। ক্লাসের রেজেষ্টারী খাতায় আবার তোমার নাম ওঠে, আর তোমার বাবার কাছে চিঠিও যায়। কিন্তু আসল ব্যাপারটা বাইরের কেউ জানত না, যে জানে, সে কোনদিন বলে নি এবং ব'লবেও না। নিরুপায় হ'য়েই আমাকে এটা ব'লতে হচ্ছে, এ জন্য তুমি আমাকে তোমার শিক্ষক ভেবে মাপ ক'র।

এতক্ষণে প্রেসিডেণ্টের পড়াও শেষ হইয়াছিল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই

তাঁহার মুখের কঠিন ভাবটুকুও আশ্চর্য্য রকমেই যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মানসপটে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল সেই দিনটির কথা।

কিছুক্ষণ প্রেসেডেণ্টের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় স্তব্ধ হইয়া দেখিলেন. তাঁহার চক্ষুর দুই প্রান্তে বড় বড় মুক্তার মত দুইটি অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইয়াছে। বিগলিত কণ্ঠে অতঃপর তিনি কহিলেন,—নির্ম্মল তা হ'লে তাদের সেই বাড়ীতেই আছে?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—আর কোথায় যাবে? মাথা রাখবার মত ঐ জায়গাটুকুই এখনো ওদের আছে।

হঠাৎ প্রেসিডেণ্ট টেবেলের উপর ঝুঁকিয়া পরিমলের দরখাস্তখানি তুলিয়া লইলেন। খাতাখানি দিবার সময় পণ্ডিত মহাশয় সেখানি টেবিলের উপরেই রাখিয়াছিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রেসিডেণ্টের দিকে চাহিতেই তিনি সবেগে উঠিয়া হাত দুইখানি জোড় করিয়া অভিবাদনের ভঙ্গীতে কহিলেন,—আমি এখন উঠছি, পণ্ডিত মশাই, একটু কায আছে। আবার দেখা হবে।

কক্ষের বাহিরে কমিটীর সদস্যগণ তখনও সাগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন সকলেই লক্ষ্য করিলেন, প্রেসিডেণ্টের মুখখানি অস্বাভাবিক গম্ভীর এবং তাহাতে উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধার দিক্ দিয়া প্রেসিডেণ্টের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তিনি সংক্ষিপ্ত গোটা-দুই কথায় এক সঙ্গে সকলকে বিদায়-অভিবাদন জানাইয়া এমন তৎপরতার সহিত মোটরে উঠিয়া বসিলেন যে, তাঁহাদের মনের কথা মনেই রহিয়া গেল।

নয়

গাড়ী স্কুলের সীমানা ছাড়াইয়া আরও কিছু দূর অগ্রসর হইতেই প্রেসিডেণ্ট সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—রোখো, রোখো।

গাড়ী থামিবামাত্রই তিনি নিজেই গাড়ীর দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন।

তিনি সোফারকে কহিলেন—আমি একটু হাঁটবো, গাড়ী নিয়ে তোমরা আস্তে আস্তে পেছনে এসো কিম্বা এগিয়ে গিয়ে চৌরাস্তায় অপেক্ষা কর।

মনিবকে ফেলিয়া গাড়ী চালাইয়া যাইতে সোফার রাজী হইল না, গাড়ী লইয়া সে পিছু পিছুই চলিল।

কত পূর্ব্বের পরিচিত পথ, কত কাল পরে পুনরায় এই পথে তিনি চলিয়াছেন! কিন্তু পূর্ব্বের ও বর্ত্তমানের চলার মধ্যে কত পার্থক্যই রহিয়াছে!

রাস্তার ধারে ধারে বরাবর কত রকমের কত গাছ। কোনটা বট, কোনটি অশ্বত্থ, কোনটি বা পাকুড়। দারুণ গ্রীষ্মেও ইহারা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের এই সুদীর্ঘ রাস্তাটির উপর কত যত্নেই ছায়া ঢালিয়া দেয়। হেমন্তে শীতে আকাশের শিশির মাথা পাতিয়া লয়। এই সব গাছের তলায় বসিয়া কত কথাই তাঁহাদের সে সময় হইত।

জনবিরল পথটুকু অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃই তিনি সহরের জনবহুল অংশে আসিয়া পড়িলেন। এ দিক্‌টায় পাশাপাশি দোকানপাট, ডাকঘর, গঞ্জ,বাজার। চলিতে চলিতে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কোন্ দোকানটি হইতে নির্ম্মল প্রায় প্রত্যহই চীনাবাদাম ভাজা কিনিত, অতি অন্তরঙ্গ কয়টি ছেলে কি আনন্দেই সেগুলি ভাগাভাগি করিয়া খাইত!

আরও খানিকটা অগ্রসর হইতেই সেই সুপরিচিত চৌরাস্তাটির

সংযোগস্থল সম্মুখেই দেখা গেল। সোজা রাস্তাটির দুই পাশ দিয়া দুইটি রাস্তা দুই দিকে গিয়াছে। একটি এই অঞ্চলের বর্দ্ধিষ্ণু অধিবাসীদের পল্লীর দিকে, অন্যটি কিছু দূর গিয়া গ্রামের পথে মিলিয়াছে।

সহসা ঝাঁ করিয়া অতীতের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনটি বন্ধুর নিকট এই স্থানে দাঁড়াইয়াই না তিনি বলিয়াছিলেন—আর দুটি দিন দেখা হবে ভাই, তার পর আর ত আমার স্কুলে পড়া হবে না!

পায়ের তলা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তাঁহার কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল, যেন অতীতের সেই দিনটিতে তিনি আবার পিছাইয়া গিয়াছেন। এই স্থানটি হইতে বিদায় লইবার সময় সহপাঠীদের অশ্রুময় চক্ষুগুলি তাঁহার চক্ষু দুটির উপর বুঝি আজও ভাসিতেছে! সারা পথ কি দুশ্চিন্তা লইয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কত কথাই ভাবিয়া-ছিলেন! কিন্তু তখন কি মনের কোণেও তাঁহার এ ভাবনা স্থান পাইয়া-ছিল যে, তাঁহারই অন্যতম সহপাঠীও তাঁহারই মত সারারাত্রি ধরিয়া তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া ভাবিয়াছে, দুই চক্ষুর পাতায় নিদ্রার পদছায়া পড়ে নাই! প্রাতেই পিতার কাছে গিয়া নিজের স্বার্থ বলি দিয়া দুস্থ সহপাঠীর শিক্ষার পথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাটা সরাইয়া দিতে আবেদন করিয়াছে, অথচ, এ কথা বাহিরের কাহাকেও জানিতে দেয় নাই!—সেই মহাপ্রাণ মানুষটির কি চরম দুর্গতি আজ! আর—তাহারই স্নেহময় ভাইটি, ঐ অন্ধের যে একমাত্র অবলম্বন, সেই বিদ্যালয়ের খালি পদটির প্রার্থী। কিন্তু তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও পদগৌরবের দাপটে ঐ পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত জানিয়াও নিষ্ঠুরের মত তাহার প্রতি কি অবিচারই করিয়াছেন!

সহসা চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল আরদালীর কথায়। সভয় বিস্ময়ে সে পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—গাড়ী এসেছে হুজুর!

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—এইখানে থাকুক, আমি ঐ দিক্‌টায় একটু বেড়িয়ে আসি।

যে দিক্‌টায় বেড়াইবার জন্য তিনি মোড় ফিরিলেন, সেই পথেই নির্ম্মলদের বাড়ী। এই পল্লীর পথঘাট ও ঘরবাড়ী সবই তাঁহার পরিচিত।

দশ

সুবৃহৎ অট্টালিকাটির অধিকাংশই বেহাত হইয়া গিয়াছে। শুধু বাহিরের যে ঘরখানিতে বসিয়া নির্ম্মলের বাবা সকাল-সন্ধ্যায় মক্কেলদের সহিত আইনের আলোচনায় ব্যস্ত থাকিতেন, সেই ঘরখানি এখনও ঠিক সেই ভাবেই বজায় আছে। তাহার সংলগ্ন কয়েকখানি ঘরে এই পরিবারটি কোনওরূপে মাথা গুঁজিয়া থাকে।

নির্ম্মল বিবাহ করে নাই। পরিমলও বিবাহ করিতে প্রথমে চাহে নাই, কিন্তু দাদার একান্ত আগ্রহে তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। সংসারটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, পোষ্য অনেকগুলি। বিধবা মা আছেন, এখনও দুইটি ভগিনী অবিবাহিতা, এক ভগিনী বিবাহিতা হইয়াও স্বামীর সংসারে স্থান পায় নাই, এইখানেই আছে। ইহা ভিন্ন পরিমলেরও কয়েকটি পুত্র-কন্যা হইয়াছে। আয়ের মধ্যে সামান্য কিছু ধান-জমির উপস্বত্ব এবং ছেলে পড়াইয়া পরিমলের স্বল্প উপার্জ্জন। তথাপি ভাইদুইটির সৌভ্রাতৃত্ব—সংসারে শান্তিটুকু পরিপূর্ণ ভাবেই ধরিয়া রাখিয়াছে।

জটিল অঙ্কের একটা সমাধান লইয়া দুই ভ্রাতায় আলোচনা চলিতেছিল। একখানা আরাম-কেদারায় নির্ম্মল দেহটাকে এলাইয়া দিয়াছিল, পরিমল বসিয়াছিল তাহারই পাশে একখানা হাতলভাঙ্গা চেয়ারে। তাহার পাশেই

ছিল একটা টেবল। অদূরে একখানা তক্তপোষ, তাহার উপর একখানা সতরঞ্চি পাতা, মাথার দিকে বিছানাটা গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। এই ঘরেই নির্ম্মল রাত্রিবাস করে এবং ইহাই তাহার শয্যা।

ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি যে বাহিরে দরজাটির পাশে দাঁড়াইয়া দুই ভ্রাতার অঙ্কের আলোচনা শুনিতেছিল, নির্ম্মলের ত তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু পরিমলও জানিতে পারে নাই। এমন কি, আগন্তুক পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিলেও পরিমলের হুঁস হয় নাই, দ্বারের দিকে পিছন করিয়া এমনই তন্ময় হইয়া সে আলোচনায় যোগ দিয়াছিল।

কিন্তু নির্ম্মল বোধ হয় অন্যমনস্কই ছিলেন। সহসা সচকিতভাবে সোজা হইয়া বসিয়া একটু অস্বাভাবিক স্বরেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—কে—কে এল?

পরিমলও ততক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিল—এক সৌম্যমূর্ত্তি অপরিচিত ভদ্রলোক ঘরের ভিতর ঢুকিয়া অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাঁহার দাদার দিকে চাহিয়া আছেন।

তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ার খানা ছাড়িয়া পরিমল উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অভ্যাগতকে কহিল,—বসুন।

আগন্তুক আবেগকম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—নির্ম্মল, আমি এসেছি তোমাকে দেখতে।

নির্ম্মলের বদ্ধচক্ষু কি তখন খুলিয়া গিয়াছিল, কিম্বা দৃষ্টিহীনের অনুভব-শক্তি এমনই তীক্ষ্ণ হয়? উচ্ছ্বসিতস্বরে নির্ম্মলকে কহিলেন,—কে! আকবর? ঠিক ধরেছি, না ভুল ক'রেছি, বল, বল?

আকবর আলি কহিলেন,—না, তুমি ঠিক ধরেছ। কিন্তু একি দেখছি, ভাই?

নির্ম্মল গদগদকণ্ঠে কহিলেন,—আমার মনে হ'চ্ছে, স্কুল থেকে ফেরবার

পথেই আমাদের যেন কথা হচ্ছে। তোমার গলার স্বর ঠিক আছে, একটুও বদলায় নি। মনে হ'চ্ছে, আমরা আবার পেছিয়ে গেছি।

আকবর আলি কহিলেন,—সারা পথটা এই কথা কতবারই যে ভেবেছি কি ব'লব! কিন্তু তোমাকে দেখে আমার যে কথা বেরুচ্ছে না, নির্ম্মল!

নির্ম্মল কহিলেন,—মনে হ'চ্ছে তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ; পরিমল চেয়ার ছেড়ে দিলেও বসনি। ব'স ভাই, তুমি আসাতে কি আনন্দ যে পেয়েছি মুখে কি ব'লব?

পরিমলও পুনরায় অনুরোধ জানাইল,—বসুন আপনি, নতুবা দাদা ব্যথা পাবেন।

চেয়ারখানা টানিয়া নির্ম্মলের কেদারাখানার আরও কাছে লইয়া আকবর আলি তাহাতে বসিলেন। ক্ষণকাল কাহারও মুখে কথা নাই। সহসা আকবর আলি প্রশ্ন করিলেন,—আমি যে স্কুলের মিটিংএ আজ এসেছি, সে কথা শুনেছিলে?

নির্ম্মল উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ। ভেবেছিলুম, পরিমল যাবে; কিন্তু ও গেল না। তবে আজ সকাল থেকে মনটা যে কি রকম ছট্‌ফট্‌ ক'রছিল, সে কথা ব'লে বোঝাতে পারব না। এমন একটা ঘণ্টা যায় নি—তোমার কথা না ভেবেছি। আর সারা স্কুল, খেলার মাঠ, ডোবা, পুকুর, বাগান সেই চৌরাস্তা—মনটা বুঝি চষে ফেলেছে।

—খুব রাগ হ'চ্ছিল, নয়?

—এ অবস্থায় রাগ কি আসে, ভাই? তারও ত একটা বিবেচনা আছে।

—তবে বুঝি দুঃখ হ'চ্ছিল?

—বুঝতে পারো নি? আমি যে সুখ-দুঃখের বাইরে।

—তবে?

এবার উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে নির্ম্মল উত্তর দিলেন,—যে ইচ্ছা হ'য়েছিল ভাই, ইচ্ছাময় ঠিক তাই পূর্ণ ক'রেছেন। তোর হাতখানা দে, আরো একটু কাছে এগিয়ে আয়—দেখি।

আস্তে আস্তে চেয়ারের ভাঙ্গা হাতলটির পাশ দিযা নিজের হাতখানি নির্ম্মলের দুইটি ব্যগ্র হাতেব মধ্যে সমর্পণ করিবামাত্রই, সজোরে একটা চাপ দিয়া উল্লাসেব স্বরে নির্ম্মল কহিলেন,—আঃ! মনে আছে আকবর, এমনি হাত ধরাধরি ক'রে পথ চলা, খেলা-ধূলা, কি আনন্দেই সে দিন কেটেছে! মনে পড়ছে?

একটা নিশ্বাস সজোরে ত্যাগ করিযা আকবর আলি কহিলেন,—তুমি নামে নির্ম্মল, মনটিও তোমার নির্ম্মল, তাই সে সব মনে পড়তেই তুমি পাচ্ছ শুধু আনন্দ। কিন্তু তোমার স্পর্শে আজ আমার দুখানা হাত যে জ্বলে যাচ্ছে, নির্ম্মল! সত্যই জ্বলে যাচ্ছে।

—কেন ভাই, কেন? এ কথা ব'লছ কেন?

—কেন? এই হাত দিযে কত বড় অপকর্ম্ম ক'বেছি, সে কথা শোন নি? জান না? যদি তার কৈফিযৎ চাইতে, যদি আমাকে তিরস্কার ক'রতে, আসবামাত্রই গোটাকতক গালাগালও দিতে, তা হ'লে হয ত কতকটা শান্তি আমি পেতুম।

আকবরের হাতখানি আরও জোরে চাপিযা নির্ম্মল কহিলেন,—আঃ, কি ব'লছ, আকবর! এ সব কথা কেন? কত কাল পরে দুই সহপাঠীর দেখা, এখন এর ভেতরে স্বার্থ-সুবিধে নিয়ে কোন কথা নেই, শুধু মনের কথা, প্রাণের কথা; আর সব ভুলে যাও।

গাঢ়স্বরে আকবর কহিলেন,—কিন্তু আমি মানুষ, ভুলতে পারি না; তুমি এত কাল যে-কথা লুকিযে রেখেছিলে, আজ প্রথম তা শুনেছি পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে। শুধু শোনা নয়, তোমার বাবার চিঠিখানাও দেখেছি।

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে নির্ম্মল বলিলেন—কি ব'লছ, আকবর! ছি! আবার ঐ কথা! আমাকে শান্তি দেবে না?

আকবর আলি কহিলেন,—কিন্তু শান্তিটা ত শুধু তোমারই একচেটে নয়, ওব উপর আমারও দাবী আছে। এত দিন অন্ধকারেই ছিলুম। এত বড় একটা রহস্যের তোষাখানা যে এখানে আছে, তা জানতুম না। যদি এখনো আমাকে যথার্থই বন্ধু বলে মনে কর, নির্ম্মল, তা হ'লে পরিমলের ওপব যে অবিচার আমি ক'রেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে দাও, এই তোমার বন্ধুর অনুরোধ।

স্নিগ্ধকণ্ঠে নির্ম্মল প্রশ্ন করিলেন,—কি ক'রতে চাও?

আকবর আলি উত্তর দিলেন, ভাইযের প্রতি ভাইয়ের যা কর্ত্তব্য, এর বেশী নয়। পবিমলেব দরখাস্ত বাতিল ক'রে যে ভুল আমি ক'রেছিলুম, এইখানে বসেই আমি সেটা সংশোধন ক'রতে চাই।

নির্ম্মল শান্ত কণ্ঠে কহিলেন,—কিন্তু এর জন্য আমার কোনো অনুরোধ নেই।

মৃদুস্বরে নির্ম্মলকে একটা ধন্যবাদ দিয়া আকবর আলি তাঁহার হাত দুইখানির ভিতর হইতে নিজের হাতখানি আস্তে আস্তে ছাড়াইয়া লইয়া পকেটে পূরিলেন।

পরিমলের দরখাস্তখানা পকেটের ভিতরেই ছিল। বুকের পকেট হইতে পার্কারেব পেনটি খুলিযা চড় চড় করিয়া তাহার উপরে কয়েক ছত্র লিখিয়া কহিলেন, এখুনি আমাকে স্কুলে ফিরে যেতে হবে।

নির্ম্মল কহিলেন,—তা হবে না, যখন সহপাঠীর বাড়ীতে মনে ক'রে এসেছ, মিষ্টিমুখ না করে যেতে পাবে না।

আকবব আলি কহিলেন,—মিষ্টিমুখ খুব চুটিয়েই ক'রেছি স্কুলে, তাহ'লেও তোমার উপরোধে ঢেঁকি গিলতেও আমার আপত্তি নেই। হ্যাঁ,

আর একটা কথা, আপাততঃ পরিমল ঐ পোষ্টেই কায করুক, কিন্তু ওর প্রতিভা পঁয়ষট্টি টাকায় বাঁধা থাকে সেটা আমার ইচ্ছা নয়।

পরিমল একটু বিস্ময়ের সুরেই কহিল,—ও পোষ্টের মাইনে কিন্তু পঞ্চাশ, পঁয়ষট্টি নয়।

আকবর আলি কহিলেন,—হ্যাঁ, কাগজে-কলমে পঞ্চাশ থাকলেও, ভাতা বলে আরো পনেরো টাকা মঞ্জুর করা হ'য়েছে। সেটা আলাদা দেওয়া হবে।

'কিন্তু' বলিয়া পরিমল প্রতিবাদের সুরে আবও কি বলিয়া উপক্রম করিতেই আকবর আলি বাধা দিয়া কহিলেন,—আমি তোমাব দাদার সহপাঠী, পরিমল, তোমারও দাদা, দাদার ওপর ছোট ভাইয়ের কথা কওয়া ঠিক নয়। নির্ম্মল, তুমি কি বল?

নির্ম্মল কহিলেন,—আমার সেই কথা, তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না এবং তোমাদের কাউকেই এ সম্বন্ধে কোন অনুরোধ ক'রব না।

আকবর আলি কহিলেন,—ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতি হবে, এমন কোন সরকারী পোষ্টে আমি পরিমলকে ঢোকাতে চাই, নির্ম্মল।

নির্ম্মলের মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল। মুখখানি তুলিয়া তিনি কহিলেন,—এমন অনেক সুযোগই পরিমলের অদৃষ্টে এসেছিল ভাই, কিন্তু ওর এই অন্ধ দাদাটির মুখ চেয়ে বাইরের সমস্ত প্রলোভনই ও ত্যাগ ক'রেছে। এই গ্রাম আর বাড়ী ছেড়ে ও কোথাও যাবে না, আমার কাছ-থেকেও প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়েছে—এ সম্বন্ধে কোন অনুরোধ ওকে ক'রতে পারব না।

আকবর আলি পরিমলের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—সামান্য এই স্কুলমাষ্টারী ক'রেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেবে, পরিমল?

পরিমল একটু হাসিয়া উত্তর দিল,—যে স্কুলের সংস্রবেই এত বড় সদ্ভাবটা আপনাদের ভেতর নিবিড় হ'য়ে উঠেছিল, সেই স্কুলের সংস্রবে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া কি অনুচিত, স্যার ?

আকবর আলি প্রশংসার ভঙ্গীতে পরিমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কথাটা আমি প্রত্যাহার ক'রছি, পরিমল। স্কুলটিকেই অবলম্বন ক'রে দুই সহপাঠীর সদ্ভাবের এই স্মৃতিটুকু তুমিই জাগিয়ে রাখো।

গুরুদক্ষিণা

পদার্থবিজ্ঞানের বহুদর্শী অধ্যাপক সুবিনয় চৌধুরী তাঁহার বালিগঞ্জের সুবিস্তীর্ণ উদ্যান-ভবনটি যেন গবেষণার উপযোগী করিয়াই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল বিভিন্ন সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, সে সমস্তই নির্ব্বিচারে ইহার উপরেই উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার আশা মিটে নাই এবং অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাটিকে পরিপূর্ণ করিতে এখনও তাঁহার সাধনার অন্ত নাই।

কিন্তু কন্যা আভা যখন-তখন বাধা দেয়, ভাবনিবিষ্ট পিতাকে সচকিত করিয়া বলে, গাছ আর পাথর ঘেঁটে তুমিও কি শেষে পাথর হ'য়েযাবে, বাবা!

মেয়ে আসিলে, বাধা দিলে, স্নানাগারের তাগিদ দিলে অধ্যাপকের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়; কোনো প্রতিবাদই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয় না, স্মৃতিপথে তখনই ভাসিয়া উঠে অতীতের একখানি এমনই স্নেহ-কঠিন মুখ! জোরে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাতের কাযগুলি ফেলিয়া তাড়াতাড়ি তিনি বলিয়া উঠেন,—চলো মা, আমার হ'য়েছে।

এত বড় বাড়ী বাগান, পাঠাগারের অসংখ্য কেতাব, গবেষণাক্ষেত্রের নানাবিধ উদ্ভিজ্জ ও দেশ-দেশান্তর হইতে সংগৃহীত জড় পদার্থের স্তূপ, সমস্তই এই মেয়েটিকে একা তত্ত্বাবধান করিতে হয়। ইহাদের ভিতর যে সকল চেতন পদার্থের সমাবেশ হইয়া থাকে, ইহারই স্নেহের সতর্কতা তাহাদিগকে সচেতন করিয়া রাখে। কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব? গৃহস্বামী, বাড়ীর মালিক, তিনি কখনো চেতন, কখনো বা অচেতন, তাঁহাকে সর্ব্বদা সচেতন করিতে এই মেয়েটির কি নিপুণ লক্ষ্য! ইহার পর আছে প্রতিপাল্যস্থানীয় কতিপয় পোষ্য; গৃহস্বামীর গলগ্রহ হইয়াও তাহাদের আত্মীয়োচিত পরিচর্য্যা পাইবার আগ্রহ, পরিচারক-পরিচারিকাদের এই সংসারানভিজ্ঞা তরুণীর শাসনপাশ ছিন্ন করিবার

প্রচণ্ড স্পৃহা এবং সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক, পিতার শিষ্যস্থানীয় অভ্যাগত তরুণ ছাত্রসমাজের তাহাকে উপলক্ষ করিয়া উপদ্রব ও কলরব।

কিন্তু সতেরো বৎসরের এই তরুণীটি পাকা গৃহিণীর গাম্ভীর্য্য ও শক্ত শিক্ষয়িত্রীর বৈশিষ্ট্য দিয়া প্রত্যেকের উপর তাহার প্রভাব এমন ভাবে প্রসারিত করিয়াছে যে, কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার যো নাই।

যে বর্ষীয়সী পিসীটি এতকাল এই সংসারটি মাথায় করিয়া চালাইযা আসিয়াছেন, যাঁহার স্নেহময় কোলটি আশ্রয় করিয়া আভা এত বড়টি হইয়াছে, তাঁহাকে এখন আভার শাসন মানিযা চলিতে হয়। বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় পৌছাইলেও অধিকাংশ গৃহিণী তাঁহাদেব গৃহগত অধিকার সহজে উত্তরাধিকারীব হাতে সমর্পণ করিতে চাহেন না, ইনিও চাহেন নাই। আভা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছে,—সংসার চালনার বযস তুমি পেরিয়ে এসেছ, পিসীমা। এখন তোমার কায শুধু কোশাকুশি নিয়ে ঠাকুরঘরে ব'সে ঠাকুর-দেবতাদের ডাকা; ও-হাতে এখন সংসারেব চাকা ঠেলতে গেলে হাতেও লাগবে, চাকাও ঘুরবে না।

পিসীমা গজ গজ করিতে করিতে বলিতেন,—নেকাপড়া শিখে তুই যেন কি হ'যেছিস্—লঘু-গুরু জ্ঞান নেই; যাকে হ'তে দেখলুম, কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করলুম, সেদিনকার মেয়ে আজ আমাকে ছেঁটে ফেলে উনি ক'রবেন বাহাদুরি! এ সব আধিক্যেতা নয়? এক রত্তি মেয়ে তুই, তোর হুকুম আমাকে মেনে চলতে হ'বে! তার চেয়ে সুবি আমাকে কাশীতে পাঠিয়ে দিক।

আভা হাসিয়া বলিত,—কাশীতে গেলেও মা অন্নপূর্ণা তোমাকে তাঁর সংসার গুছোতে ডাকবে না, পিসীমা। তার চেয়ে ও-সব ঝক্কি ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে অন্নপূর্ণাকে ডাকা কি ভাল নয়!

পিসীমা কথাটায় কান না দিযা ঝঙ্কার তুলিতেন,—থাম্ তুই! বলে

'হাতী ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে কত জল।' সংসার চালানো অমনি মুখের কথা কি না!

কিন্তু মুখটি বুজিয়া আভা যখন সংসারের চাকাগুলি ঘুরাইতে হাত লাগায় এবং তাহার হাতের স্পর্শ পাইয়া বিশাল শকটখানি স্বচ্ছন্দগতিতে চলিতে থাকে, পিসীমা তখন পোষ্যবর্গকে শুনাইয়া বলিতেন, চালাতে পারলেই ভালো, আমার কি! যাতে হেজে পুড়ে না যায়, সেই জন্যই ত সংসারটা মাথায় ক'রে পড়েছিলুম। হাড় মাস কালী হ'য়ে গেছে, অরুণের রথের মতন ছুটে মরেছি উদয়াস্তকাল, এখন ছাড়ান পেলে ত বাঁচি।

অভার মা আভাকে ইঁহারই কোলে তুলিয়া দিয়া অকালে পরলোকের পথে পাড়ি দিয়াছিলেন। আভার বাবার বয়স তখন বেশী নয়, এ অবস্থায় মাতৃহারা শিশুকে উপলক্ষ করিয়া অনেক বিপত্নীককেই পুনরায় নবোঢ়া পত্নীর সাহচর্য্যে শোকের প্রভাব কাটাইতে দেখা যায়। কিন্তু সুবিনয়ের উপর এ সম্বন্ধে যখন নানাদিক্ দিয়া সবিনয় অনুরোধ আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তিনি তাঁহার এই দিদিটিকে নির্দ্দেশ করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন,—যে প্রতীকটি সে রেখে গেছে, তাকে রক্ষা ক'রবার মত লোক আমার সংসারে আছে।

শেষে দিদিও যখন ম্রিয়মাণ ভাইটিকে আনন্দময় করিতে অনুরোধ-কারীদের পক্ষসমর্থন করেন, সুবিনয় তখন গাঢ়স্বরে ইঁহাকে বলিয়াছিলেন, —আমি যে বড় মুখ ক'রে তোমাকে দেখিয়ে দশজনের মুখ বন্ধ ক'রেছি, দিদি! সকলেই এ অবস্থায় যা ক'রে থাকে, এসো না আমরা তার উল্টোটাই ক'রে যাই।

দিদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি ক'রতে চাও?

সুবিনয় উত্তর দিয়াছিলেন,—আভাকে তারই আদর্শে গড়ে

তুলতে চাই। সে যেমন সকল রকমে আমাদের সকলের ভার নিয়েছিল, কোথাও একটু ঠোকাঠুকি হ'তে দেয় নি, কারুর কোনো নালিশ তোলবার পথ রাখেনি, চারদিকই তার প্রভাব তার স্মৃতির সঙ্গে যেমন জড়িয়ে আছে,—আমি চাই তেমনি থাকে।

দিদি তথাপি কহিয়াছিলেন,—বেশ ত দেখে শুনে ডাগর-ডোগর বড় মেয়ে এনে তাকেও ত শিখিয়ে পড়িয়ে তেমনি ক'রে তোলা চলে। যেমন শেখাবে তেমনি হবে।

সুবিনয় আপত্তি করিয়াছিলেন,—তা হয় না, দিদি! তাতে তার আদর্শ রক্ষা হবে না, হবে তার স্মৃতির লাঞ্ছনা। তার দান যখন তুমি হাত পেতে নিয়েছ, তখন তোমারই উচিত দিদি, আভাকে দিয়েই তার আদর্শ রক্ষা করা।

ইহার পর দিদি আর কোনো প্রতিবাদ তুলিতে পারেন নাই। সুবিনয় মনের মত করিয়া শিশু-মন গঠন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। দিদিকেও তিনি এ সম্বন্ধে নানারূপ নির্দ্দেশ দিতেন—যাহাতে আভা নিজেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনধারার প্রণালী রচনা করিতে পারে।

বড় হইয়া সেই মেয়েটিই যখন দেখিল, জড়পদার্থ লইয়া অবিরাম ভাবনা-চিন্তায় তাহার পিতার মানবদেহেও জট পাকাইয়া উঠিতেছে ও অচিরেই তাহা জড়দেহে পরিণত হইবে, তখন সে একদা পিতার গবেষণাগারে হানা দিয়া জানাইল,—এ সব চলবে না, বাবা! ওদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারো, কিন্তু সময় মত আহার, নিদ্রা ও বিশ্রাম চাই। তার একচুল এদিক্ ওদিক্ হ'তে দেব না তোমাকে।

বিস্ময়ানন্দে সেই দিন অধ্যাপক সুবিনয় চৌধুরীকে অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল,—ঠিক! কল্পনা সত্য হ'য়েছে, চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি তা হ'লে! তাঁহার স্মৃতিপথে তখন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণীর প্রতিভা-

প্রদীপ্ত সুন্দর মুখখানি। সময়ানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে সেই মুখের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ, স্নেহের সুচারু শাসন!

পিসীমা যখন ভাইকে ডাকিয়া অভিযোগ করিলেন,—শুনেছিস সুবি, তোর মেয়ে আমার হাত থেকে সংসার ছিনিয়ে নিয়েছে; আজ থেকে নিজের হাতেই সব ক'রছে কর্ম্মাচ্ছে। আর আমাকে ঠাকুরঘরের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। কথায় বলে না—যে দেখালে যো, তারেই দেখায় ভো! আমাব দশাও তাই হ'য়েছে।

সুবিনয় হাসিয়া উত্তর দিলেন,—শুধু তোমার নয় দিদি, আমারো। ওতো আমার কাযের রুটিন বেঁধে দিয়েছে। ব'লেছে, তার এক চুল একদিন এদিক্ ওদিক্ হ'লে সমস্ত ওলট-পালট ক'রে দেবে।

দিদি কহিলেন,—তা ব'লে বুড়ো বযসে তোর ঐ এক রত্তি মেয়ের শাসন মেনে চ'লতে হবে? পারবি, সুবি?

সুবিনয় উত্তর দিলেন,—ভুলে যাচ্ছ কেন, দিদি, ষোলটি বছর ধ'রে এই সাধনাই ত ভাই-বোনে ক'রেছি, আজ তা সার্থক হ'য়েছে।

আভা একদিন তাহার বাবাকেকহিল, —আচ্ছা বাবা সারাদিন ত কলেজে ছেলে পড়াও, তাতেও কি আশা মেটে না তোমার? বাড়ীতে আবার ওদের এনে জটলা ক'রবার কি দরকার?

মেয়ের কথায় অধ্যাপকের মুখে অপ্রসন্নতার একটু ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল; তিনি কহিলেন,—তোমাকে যখন পাইনি মা তার অনেক আগেই ওদের পেয়েছি; আর এমনি ক'রেই এই তিরিশ বছর ধ'রে ওদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে আসছি।

আভা থপ করিয়া কহিল—কিন্তু যারা তোমার কাছে আসে, তাদের ভেতর তিরিশ বছরের ছেলে ত একটিও নেই, বাবা।

পূর্ব্ববৎ হাসিমুখেই অধ্যাপক কহিলেন,—কিন্তু আমি ত ঠিক আছি, মা। আর এই তিরিশটি বছর ধ'রে যাদের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রছি, তাদের স্মৃতিগুলো এরাই যে জাগিয়ে আসছে পর পর। একদল এসেছে, তারপর কত রকমের কত দাগ টেনে তারা চ'লে গেছে ; তারপর এসেছে আর একদল, এই আনাগোনাই ওদের চলছে, বরাবর এই পুরোনো পাদপটিকে লক্ষ্য ক'রে। এদের সঙ্গ আমাকে আনন্দ দেয় ; কলেজে খানিকটা সময় যদিও এদের নিয়ে কাটিয়ে দিই, কিন্তু তাতে ঠিক তৃপ্তি পাই না—যত তৃপ্তি পাই এখানে ওদের সঙ্গে আরো খোলাখুলি মিশে, আমার চিন্তাধারা দিয়ে ওদের ধরে রেখে, ওদের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য আন্তরিকতা সৃষ্টি ক'রে।

আভা কহিল,—কিন্তু বাবা, তুমি কি মনে কর, এরা সকলেই তোমার কাছে আসে জ্ঞানলাভের আশায় ? সেইটেই ওদের উদ্দেশ্য ?

অধ্যাপক উত্তর দিলেন,—জ্ঞানের পিপাসা সকলের ত সমান নয়, মা। এখানে ওরা এসে কিন্তু অনেক কিছুই পায়। জ্ঞানের অহঙ্কার করি না —কিন্তু বয়সের অহঙ্কার রাখি, সেদিক্ দিয়ে এরা পায় এই বয়োবৃদ্ধের সঙ্গ। ওদের জন্য কত পদার্থই আমাকে সংগ্রহ ক'রতে হ'য়েছে ; কেউ কেউ তাতে আনন্দ পায়। পাঠাগারে অসংখ্য গ্রন্থ, নানাবিধ সাময়িক পত্র ; ওরা পড়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ ক'রতে পারে। তারপর তোমার পরিচর্য্যায় ওরা যখন পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়—তরুণ মনগুলির তখনকার উচ্ছ্বসিত উল্লাস আমাকে যেন অভিভূত ক'রে দেয়।

আভা কহিল,—এখানে আসার আসল উদ্দেশ্যই ওদের ঐটি, বাবা। কাযে কিন্তু সবাই ফাঁকি দেয়। তোমার লেকচার ক'জন শোনে ?

অধ্যাপক বিবর্ণমুখে কহিলেন,—সকলের সম্বন্ধে একথা বলা ঠিক নয়, মা। হয়ত আমার বুক্তি তাদের প্রাণস্পর্শ করে না, বিরক্ত হয় ; তাই

হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ওদের ধৈর্য্য থাকে না, অনেকে উঠে যায়। কিন্তু সকলে নয়, মা।

আভা কহিল,—তুমি ওদের চেন না, বাবা। হিসেব ক'রে ওরা আটঘাট বেঁধে ভদ্রতা বজায় রাখে। তুমি যখন ওদের কোনো বিষয় বুঝিয়ে দিতে ব'কে চলেছ, কিম্বা একবারে তন্ময় হ'য়ে পড়েছ, ওরা তখন পালা ক'রে যাওয়া-আসা করে। যে দল বাইরে আসে, তাদের কি লাফালাফি, কি আনন্দ, কত রকমের জুলুম; আসুন চা, দিন খাবার, আসুন গল্প করি!—এসব আমি প্রায়ই দেখি আর মুখটি বুজে সহ্য করি।

অধ্যাপক হাসিয়া কহিলেন,—ওটা হ'চ্ছে তারুণ্যের চাঞ্চল্য। আমিও যে কিছু কিছু বুঝি না তা নয়। কিন্তু বরাবরই এ রকম হ'য়ে আসছে। এমন কতকগুলো ছেলে আছে, গোড়া থেকেই যাদের বনেদ কাঁচা, কোনো বিষয়েই বেশীক্ষণ মন নিবিষ্ট ক'রতে পারে না, কিছুই তলিয়ে বুঝতে চায় না, ভাসাভাসি যা পায়, সেইটুকুই শিখে মনে করে সব শিখে ফেলেছি। এই দলের আসা যাওয়াই সার হয়। আবার কেউ কেউ দলে না ভিড়ে কায গুছিয়ে নেয়, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম।

আভা কহিল,—তোমার ঐ এক পাল ছাত্রের ভেতর একটি মাত্র ছেলেকে দেখিছি বাবা, সে শুধু দলে ভিড়ে না, হুল্লোড় করে না, শেষ পর্য্যন্ত তোমার মুখখানির দিকে চেয়ে ব'সে থাকে।

অধ্যাপক কহিলেন,—বুঝতে পেরেছি, পরিতোষের কথা ব'লছ। ছেলেটি সত্যিই ভালো, কথা খুবই কম কয়, কিন্তু বুঝতে চায়।

আভা কহিল,—এই ছেলেটিকে নিয়ে ওরা কত কথাই বলে, আর কত রকমের খেতাব ছেলেটিকে দিয়েছে।

অধ্যাপক সহাস্যে কহিলেন,—বটে!

আভা কহিল,—আমাকে যে সব দিকেই নজর রাখতে হয়, সবার

কথাতেই কান না দিলে নয়! তাই ওর সম্বন্ধে ছেলেদের কত ঠাট্টাই শুনি! ছেলেটি নাকি—গাছের পোকা, পুস্তকের কীট, নিরীহ পদার্থ, গরীব বেচারী, এমনি কত কি!

অধ্যাপক এবার একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—যার ব্যক্তিত্বে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে, সে নীরব থাকলেও, তার নিন্দুকরাই কলরব ক'রে তাকে প্রসিদ্ধ ক'রে তোলে। তার সাক্ষীই এই পরিতোষ। নিজের সম্বন্ধে নিজে কিছুই সে বলে না, তবুও তাকে নিয়ে আর সকলের আলোচনা।

আভা মুখখানা একটু কঠিন করিয়া কহিল,—কিন্তু বাবা, আমার ওসব ভালো লাগে না, এক একবার রাগ হয়। একটা লোককে সকলে মিলে আঘাত দেবে, তার জামা-কাপড়ের ত্রুটি দেখিয়ে তাকে অবহেলা করবে, এ সব কি ভাল দেখায়, না, সহ্য করা যায়? তা ছাড়া, ওদের ভেতর এমনও কেউ কেউ আছে, যাদের কথা শুনলে মন বিষিয়ে ওঠে, মিশতে আর ইচ্ছে করে না।

অধ্যাপক ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিলেন,--দেখ মা, বনেদ যেখানে পাকা, ঝড়-জলে তার কিছু ক্ষতি করতে পারে না। আমি যে গোড়া থেকেই তোমাকে শক্ত ক'রে তৈরী করেছি, মা। সংসারটা মাথায় নিয়ে সুসার ক'রে গুছিয়ে চালিয়ে জিতে গেছ, সংসারের বাইরেও ত ঝঞ্ঝাট কম নয়, মা। কোন্ অবস্থায় কখন পড়তে হবে, তার ত ঠিক-ঠিকানা নেই, তাই এদিকেও তোমার অগ্নিপরীক্ষা চলেছে; এটা পার হ'তে পারলেই সব রকমে চৌখস হবে তুমি। যে যুগ এখন এসেছে, পুরুষদের সঙ্গে মেলা-মেশা তাতে অপরিহার্য্য, কিন্তু মেশবার মত শক্তি আগে সঞ্চয় করা চাই; যে মেয়ে এ সম্বন্ধে শক্ত নয়, শক্তি-সামর্থ্য নেই, কিছুতেই তার মেশা উচিত নয়। এই পরীক্ষাই তোমার চলেছে।

আভা তাহার মুখে হাসির একটা তীক্ষ্ণ ঝিলিক আনিয়া কহিল,—কিন্তু বাবা, তোমার কোনো কোনো ছাত্রকে যদি এই সূত্রে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়ে ফেলি, তা হ'লে তখন যেন বিরক্ত হ'য়ো না।

অধ্যাপক তাড়াতাড়ি কহিলেন,—ছি! সেটা কি ভালো হবে, মা! ওরা সকলেই এখানে অভ্যাগত, আমি ওদের প্রত্যেককেই সন্তানের মত দেখি। ওদের মধ্যে কেউ যদি তোমার ব্যবহারে আঘাত পায়, সে আঘাত যে আমাকেই পীড়া দেবে, মা! আমি ত বরাবরই ওদের সম্বন্ধে তোমাকে ব'লে আসছি মা, যেন ওদের পরিচর্য্যায় সাম্যভাবের অভাব না হয়, ওরা যে সকলেই এখানে সমান স্নেহের দাবী নিয়ে আসে।

কিন্তু পিতার শেষের কথায় আভার চিত্তে শিহরণ উঠিল! সে অনুভব করিল, এই সমানাধিকারবাদেব দাঁড়িপাল্লাটির একটা দিক্ যেন তাহার অজ্ঞাতে আস্তে আস্তে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং একটি মাত্র ছেলের চাপে ইহা সম্ভব হইয়াছে, সেই ছেলেটি পরিতোষ!

সে দিন গবেষণা-গৃহে অধ্যাপক চৌধুরী যে সময় জড়-বিজ্ঞানের সহিত প্রাণিবিজ্ঞানের অঙ্গাঙ্গী সামঞ্জস্যের বিষয়টি তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীকে বিশদভাবে বুঝাইতেছিলেন, আভাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তন্ময় হইয়া পিতার কথাগুলি শুনিতেছিল।

আলোচ্য প্রসঙ্গে একটা ছেদ পড়িতেই আভাকে উঠিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদলেও একটা চাঞ্চল্য উঠিল। অখিল নামক ছেলেটি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি ছেলেকে অতিক্রম করিয়া হাতখানা ঘুরাইয়া তৃতীয় ছেলেটিকে সজোরে চিমটি কাটিল ও সঙ্গে সঙ্গেই হাতখানা টানিয়া লইয়া পুনরায় সোজা হইয়া বসিল, যেন সে স্যারের লেকচারে একেবারে অভিনিবিষ্ট। আহত ছেলেটি রীতিমত জ্বালা অনুভব করিয়া কোপদৃষ্টিতে দুই পার্শ্বের দুইটি ছেলের দিকে তাকাইয়া উভয়কেই অঙ্গুলীর খোঁচা

দিল। কিন্তু তাহাদের এক জন মৃদু হাসিয়া অখিলের দিকে তর্জ্জনীটি হেলাইয়া দিল। ছেলেটির তখন বুঝিতে বিলম্ব হইল না, প্রকৃত অপরাধী কে! কিন্তু একটু পরে অখিলের সহিত তাহার চোখাচোখি হইতে সে যখন তাহার চক্ষুর দৃষ্টিটা পাকাইয়া প্রখর করিল, অখিল অমনই তাহার দৃষ্টিতে ইঙ্গিত ভাবিয়া উদয় নামক ছেলেটিকে আক্রমণ করিবার নির্দ্দেশ দিল। অখিল যে ছেলেটিকে চিমটি কাটিযাছিল, তাহার নাম রমেন। ইহারই প্রায় সম্মুখে উদয বসিযাছিল। তাহাকে বিব্রত কবিতে বমেনকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। নিজের জ্বালাটুকু সে উদযের অঙ্গে সঞ্চার করিয়া দিল। উদয় ছেলেটি অতিশয নাবাকাতুরে, একটু কিছু হইলেই অস্থিব হইয়া উঠে; এক্ষেত্রেও হইল। সবেগে উঠিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল,—কি কামড়ালো!

রমেন কহিল,—কি আর, ব্যগ, ছারপোকা।

অখিল কহিল,—দূব বোকা, চামড়া-আঁটা চেয়ার, ছারপোকা এল কোথা থেকে?

রমেন আহত স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রশ্ন কবিল,—তবে কি?

অখিল চাপা কণ্ঠে উত্তর দিল,—চেয়ারখানার জড়দেহে জীবন সঞ্চার হ'য়েছে, ওই কামড়েছে।

অধ্যাপক মহাশয় এই সময় কোনো প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধানে কক্ষের প্রান্তদেশে একটা আলমারির ডালা খুলিতেছিলেন।

সুবোধ নামক ছেলেটি তন্দ্রাতুর অবস্থায ঢুলিতেছিল, তাহার মাথাটি এক একবার পার্শ্বের ছেলেটির কাঁধের উপর হেলিয়া পড়িতেছিল, পরক্ষণেই পুনরায় সে সচকিত ভাবে আপনাকে সামলাইয়া লইতেছিল।

অখিল যেন একটা সূত্র পাইল। সে তাড়াতাড়ি পকেট হইতে পেনসিলটি বাহির করিয়া ছুরী দিয়া চাঁচিয়া তাহার মুখটি সূক্ষ্ম করিয়া

লইল। অতঃপর সেটিকে ভল্লের আকারে নিদ্রালু ছেলেটির দিকে হেলাইয়া দিল। একটু পরেই তন্দ্রাবশে মাথাটি তাহার ঢুলিতেই সুরক্ষিত পেনসিলের সূক্ষ্ম মুখটি তাহার চাবালিতে বিঁধিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

অধ্যাপক ইতিমধ্যে বইখানি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার আসনে বসিয়াছিলেন। আর্ত্তস্বরে চমকিত হইয়া কহিলেন,—হ'ল কি?

অখিল উপরপড়া হইয়া উত্তর দিল,—বিশেষ কিছু নয় স্যার, জড়পদার্থ হ'লেও ঐ পেনসিলটার কতটা সামর্থ্য নকুল তার পরীক্ষা ক'রছিল!

নিদ্রালু ছেলেটির নাম নকুল। সে ঈষৎ আরক্ত দুই চক্ষু পাকাইয়া অখিলের দিকে চাহিয়া বিদ্ধ স্থানটিতে ঘন ঘন হাত বুলাইতেছিল।

পরিতোষ প্রফেসরের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল। অখিলের বেশী আক্রোশ তাহারই উপরে। কিন্তু এই ছেলেটিকে বিব্রত করিবার একান্ত আগ্রহ থাকিলেও সহজে তাহার নাগাল পাইবার উপায় নাই; বিশেষতঃ অখিলের দুষ্ট মনোভাব যেন মনে মনে অনুভব করিয়াই পরিতোষ সর্ব্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকে।

আজ পরিতোষকে জব্দ করিতে অখিলের রোক চাপিয়া গেল। কিন্তু সে অধ্যাপকের অজ্ঞাতে পরিতোষের উপর যতগুলি আক্রমণ চালাইল, সে নিরুত্তরে সেগুলি অতিক্রম করিয়া অখিলকে অপ্রস্তুত করিয়া দিল। অবশেষে অখিল এক কাণ্ড বাঁধাইয়া বসিল। টেবলের তলা দিয়া দড়ির যে ফাঁসটা পরিতোষের পায়ে পরাইবার জন্য সুকৌশলে চালনা করিতেছিল, তাহা হিসাবের ভুলে প্রফেসরের একটি পায়ে বাঁধন পরাইয়া দিল। ফাঁসের অপর প্রান্তটি অখিলের পায়ে বাঁধা ছিল, এবার সাফল্যের আনন্দে অখিল নিজের পায়ে একটা প্রচণ্ড টান দিতেই একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি গবেষণাগারের বিপুল গাম্ভীর্য্যে আঘাত করিল।

সহসা এ ভাবে আকর্ষিত হওয়ায় অধ্যাপক চৌধুরীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার হাত হইতে বইখানা পড়িয়া গেল, টেবলখানি ধরিয়া যদিও নিজে কোনো রকমে নিশ্চিত পতন হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, কিন্তু অখিল সেই সময় নিজের ভুলটুকু বুঝিয়া পার্শ্ববর্ত্তীদিগকেও তাহার কৃত অপরাধটুকুর অংশীদার করিতে একটা রীতিমত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া ফেলিল।

পরিতোষ তাড়াতাড়ি অধ্যাপকের টেবল হইতে কাগজকাটা ছুরিখানি লইয়া দড়িটি কাটিয়া দিল। তাহার পর স্থির দৃষ্টিতে অখিলের দিকে চাহিয়া শান্তস্বরে কহিল,—তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, অখিল।

যদিও কতিপয় সহাধ্যায়ী ইতিপূর্ব্বেই অখিলের দিকে চাহিয়া 'সেম্-সেম্' বলিয়া ধিক্কার দিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে অখিল ততটা ক্ষুব্ধ হয় নাই—পরিতোষের এই অনুযোগ তাহাকে যতটা বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল।

অধ্যাপক মহাশয় অখিলের দিকে চাহিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদুস্বরে শুধু কহিলেন,—অখিল, তুমি কি অসুস্থ ?

আভা ইহাদেরই জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিতেছিল, হলের অপর পার্শ্বে আর একখানি প্রশস্ত ঘরে। গোলযোগ শুনিয়াই এ ঘরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। পরিতোষ তখন ফাঁসের দড়ি কাটিয়া অখিলকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল—তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। কণ্ঠে চাঞ্চল্য নাই, উত্তেজনা নাই, অথচ এই অবিচলিত স্বরে কি অপরিমিত জ্বালা! আর অখিলের বিরুদ্ধে ইহাই সম্ভবতঃ এই ছেলেটির প্রথম প্রতিবাদ। আভার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, নিজের সম্বন্ধে এই ছেলেটি যতই উদাসীন থাকুক, সম্মানভাজনের সম্বন্ধে সে একেবারে নির্ব্বাক্ নহে।

কিন্তু পিতার প্রতি অখিলের এই অশিষ্ট আচরণ ও স্পর্দ্ধা আজ

আভাকেই উত্তেজিত কবিয়া তুলিল। অখিল পরিতোষের কথাটা সহ্য করিতে পারে নাই, আভার ভ্রূকুটিও সহ্য করিতে পারিল না। সে সহসা কহিয়া উঠিল,—এ কায পরিতোষের, স্যাব !

পরিতোষ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্যারের দিকে চাহিল মাত্র, কোনো উত্তর দিল না।

অধ্যাপক কহিলেন,—তোমার কথা আমি বিশ্বাস ক'রতে পারছি না, অখিল।

অখিল কহিল,—আমি প্রমাণ দিচ্ছি, স্যার ! এই দড়িটা ওরই, ছুরিখানা গুছিয়ে রেখেছিল, আর স্যারেব কাছেই ওর চেয়ার।

তথাপি পরিতোষেব মুখে কথা নাই, অভিযোক্তার মুখের দিকে একটিবার শুধু সে চাহিল।

আভা আর স্থির থাকিতে পারিল না, আসামীর পক্ষ লইযা তাহাকেই জেরা করিতে হইল। অখিলের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিল,—দড়িটায কি ওঁর নাম লেখা আছে, অখিল বাবু ? ছুরিখানাও ত বাবার টেবলেই রয়েছে দেখছি, আর ঐখানেই থাকে ! আজও আমি ঐখানে সাজিয়ে রেখে গেছি। তার চেয়ে আপনি বললেন না কেন, আপনার স্যারই এই কাণ্ডটা বাঁধিয়েছেন।

অখিল কৃত্রিম সঙ্কোচের ভঙ্গীতে কহিল,—অমন কথা ব'লবেন না, স্যার কেন ক'রতে যাবেন !

আভা কহিল,—চালাকীতে আপনি যখন অজেয়, তখন আপনাকে অপ্রস্তুত ক'রবার হয় ত প্রয়োজন হ'য়েছিল !

অধ্যাপক মহাশয় এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটার এই বলিয়া উপসংহার করিয়া দিলেন,—তুমি এদের জলখাবার সাজাও, মা। অখিল এবার নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হ'য়েছে। তুমি দেখে নিও, আমার অধ্যাপনার সময়

আর সে এ রকম আচরণ ক'রবে না এবং কৃত অন্যায়ের উপর মিথ্যার আবরণও পরাবে না।

আভা তাহার প্রখর দৃষ্টিতে আর একবার অখিলের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

জলযোগের ঘরে আভাকে কেন্দ্র করিয়া ছেলেদের মজলিস বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল।

অখিল ছেলেটির কিছুতেই কুণ্ঠা নাই। ধরা পড়িলেও সে নত হইবে না, পরাজয়কেই সে জয়ের মর্য্যাদা দিয়া বাড়াইতে চায়। কথায় তাহার সহিত কাহারও আঁটিয়া উঠিবার যো নাই। সকল বিষয়েই এই ছেলেটির অতিরিক্ত রকমের বাড়াবাড়ি দেখা যায়। নিজের সম্বন্ধে সে অপরিমিত গর্ব্বিত এবং কথায় কথায় তাহার গর্ব্বের বিষয়বস্তুগুলি প্রকাশ করিয়া সে সকলকে চমৎকৃত করিতে প্রয়াস পায়।

এ বাড়ীতে যাহারাই আসে, তাহারাই সবিস্ময়ে বার বার শুনিয়াছে, অখিল জমিদারের বংশধর, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ নবাবের সহিত লড়াই করিয়াছিল। জলপাইগুড়িতে অখিলের বাবার চা-বাগান আছে, সেখানে কত লোক খাটে, হাকিমের মত মোটা বেতন লইয়া এক জন শ্বেতাঙ্গ সেই বাগান চালায়। তাহাদের প্রচুর আয়, ইহা ছাড়া ঐ জেলায় তাহাদের তিনখানা জমিদারী। বাড়ীতে এক পাল হাতীও আছে। সে যখন দেশে যায়, ষ্টেশনে হাতী আসে। মাহুতকে রুখিয়া নিজেই সে হাতীকে সায়েস্তা করিয়া চালায়। এ সম্বন্ধে বহু রোমাঞ্চকর গল্প রচনা করিয়া সে তাহার শ্রোতাদের অন্তরে শিহরণ তুলিত।

অপর ছেলেরা জমিদারের কথা কেতাবে কাগজেই পড়িয়াছে, কাযেই এই জমিদারপুত্রটিকে তাহারা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতেই দেখিত এবং প্রশ্নের উপর

প্রশ্ন করিয়া এ সম্বন্ধে প্রবাদাশ্রিত অজ্ঞাত রহস্যগুলি উদ্ঘাটিত করিতে লালায়িত হইত।

ইহাদের প্রশস্তি অখিলকে যতটা আনন্দ দিত, পরিতোষের উপেক্ষা ততখানি ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিত। যখনই সে নিজের কথা পাড়িয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে যে, পরিতোষ পাঠে মন নিবিষ্ট করিয়াছে কিম্বা উঠিয়া গিয়াছে। হইতে পারে, সে অতিশয় দরিদ্র ও কোনো অখ্যাত বংশের সন্তান, কিন্তু ধনাঢ্য সহপাঠীর সম্বন্ধে তাহার এ বিরাগ কেন? অখিল তাহার শ্রোতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিত,—ইদানীং জমিদারের বিলোপ করতে জমিহীন লোফারদের যে আন্দোলন চ'লেছে, আমাদের পরিতোষবাবু সেই দলের নিশ্চয়ই।

আভা কথাটা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিয়াছিল,—
—সে ত ভালোই, কলেজে যেটা পড়ি, আপনারা দু'জনেই দুপক্ষের হ'য়ে সেটা দেখিয়ে দেবেন। আমরাও বুঝবো—কোন্ দল ভারি।

সেইদিন হইতেই অখিল এই মেয়েটির সম্মুখে পরিতোষের সহিত একটা বোঝাপড়া করিবার সুযোগ খুঁজিয়া আসিতেছে, কিন্তু পরিতোষ তাহাকে সে সুযোগ দেয় নাই।

আজ পরিতোষকে অপ্রস্তুত করিতে গিয়া সকলের সমক্ষে সে নিজেই অপ্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার সাহস ও চালাকী তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। অবশেষে অধ্যাপকের নির্দ্দেশটুকু মাথায় লইয়া এবং পরাজয়ের সমস্ত কালিমা ও-ঘরে ঢালিয়া সে যখন জলযোগের টেবলে আসিয়া বসিল, কে বলিবে একটু পূর্ব্বেই এই ছেলেটি একটি রীতিমত দুষ্কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে!

সকলেই তাহার দিকে সকৌতুকে চাহিয়া আছে দেখিয়া অখিল গম্ভীরভাবে কহিল,—লক্ষ্যটা আমি ঠিকই ক'রেছিলুম, পরিতোষ সেটা

জানতে পেরে তার পা'টা সরিয়ে নিয়েছিল, তাইতেই স্যারের পায়ে ওটা জড়িয়ে যায়।

সুবোধ আভার দিকে চাহিয়া কহিল,—শুনেছেন ?

আভা বিদ্রূপের সুরে কহিল,—অথচ স্যারের সামনে দোষটা পরিতোষ বাবুর ঘাড়ে দিব্যি চাপাচ্ছিলেন !

অখিল কহিল,—বাহাদুরি ত ঐখানে ! দোষ ক'রে সেটা গাপ্ করা, কিম্বা আর এক জনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সাফ্ বেরিয়ে আসাই ত এ যুগের বীরপুরুষদের লক্ষণ !

রমেন কহিল,—ওটা হ'চ্ছে চালাকী।

উদয় কহিল,—বিবেকানন্দ ব'লেছেন,—চালাকীর দ্বারা কোনো মহৎ কায হয় না। অতএব, তোমার ও কাযটা খুব অন্যায় হ'য়েছে।

অখিল দৃঢ়স্বরে কহিল,—অথচ, ঐ বিবেকানন্দই ব'লেছেন, জড়পদার্থের মত চুপ ক'রে বসে থাকার চেয়ে ডাকাতি করাও ভালো।

আভা কহিল—তাই বুঝি ডাকাতিটা শিক্ষাগুরুর ওপর দিয়েই চালিয়ে দিচ্ছিলেন।

অখিল তৎক্ষণাৎ দাঁতে জিহ্বা কাটিয়া কৃত্রিম বেদনার ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল,—অমন কথা ব'লবেন না, ওটা ঠিক কাকতালীযবৎ হ'য়ে গেছে। আমার লক্ষ্যটা পরিতোষের দিকেই ছিল, এমন কি, আপনি তার হয়ে ওকালতী না ক'রলে, দোষটা তার ঘাড়েই পড়তো।

আভা কহিল,—ও বেচারীর ওপর আপনার এই বিদ্বেষের কি কারণ, অখিল বাবু! উনি ত আপনাদের কোন কথাতেই থাকেন না। এই দেখুন না, আপনারা এখানে গল্প ক'রছেন, তিনি বাবার কাছে ব'সে নোট লিখছেন, বাবার হাতের অনেক কাযেই উনি কত সাহায্য করেন—

অখিল মুখখানা মচকাইয়া কহিল,—সাহায্য করেন কিম্বা সাহায্য পান, সে সন্ধান স্যারের কাছে নিয়েছেন ?

আভার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, রুক্ষকণ্ঠে কহিল,—এ আপনার অনধিকার চর্চ্চা, অখিলবাবু ! অন্যের সম্বন্ধে সঠিক কিছু না জেনে কোনো মত প্রকাশ আর কখনো ক'রবেন না।

অখিল কহিল,—আপনার স্বভাবটাও ক্রমশঃ শিক্ষয়িত্রীর মত হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। আপনি পরিতোষকে ঢাকবার যত চেষ্টাই করুন, তার চাল-চলন, কথাবার্ত্তা, এমন কি কাপড়-জামাটি পর্য্যন্ত জানিয়ে দেয় যে, রুচির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ ওর নেই এবং অভাবেরও অন্ত নেই।

আভা জিজ্ঞাসা করিল,—এ কথা ব'লবার মানে ?

অখিল উত্তর দিল,—মানে আছে। আপনি ওর জামা-কাপড়ের দিকে একটু লক্ষ্য রাখলেই বুঝতে পারবেন, একটি জামা আর একই কাপড় উপরি উপরি কত দিন পরে আসে।

অন্যান্য ছেলেরাও কথাটার সমর্থন করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আভা শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল,—জামা আর কাপড় দিয়েই তা হ'লে আপনারা ওঁর বিচার ক'রতে চান ? তা হ'লে আপনাদের মতে অভাবটাও অপরাধ ?

অখিল কহিল,—আমি অপরাধের কথা বলিনি, রুচির কথা ব'লছি।

আভা কহিল,—তা হ'লে আমার বাবাকেও আসামী হ'তে হয়, যেহেতু, পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁর কোনো রুচিই নেই।

অখিল তাড়াতাড়ি কহিল,—আপনার বাবার কথা আলাদা, তিনি সত্যযুগের লোক, উনি যা পরেন, তাতেই ওঁকে মানায়। এই যে মহাত্মা গান্ধী, হাফ্ নেকেড বললেই হয়,—কিন্তু ওঁর কথা কি এখানে ওঠে ?

আভা হাসিয়া কহিল,—তা হ'লে যত দোষ ক'রেছেন আপনার পরিতোষ! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে লোক এই টেবলে নেই, তাঁর সম্বন্ধে এ সব আলোচনা কি ঠিক?

অখিল কহিল,—তাঁর সাহস থাকে, আমাদের আলোচনায় যোগ দিন। আমি বরং তাঁর অসাক্ষাতে তাঁর পক্ষ হ'য়েই একটা প্রস্তাব করছি—আমাদের ভেতর থেকে চাঁদা তুলে ঐ ভদ্রলোকটির ব্যবহারের জন্য গোটা-কতক হাল-ফ্যাসানের পোষাক তৈরী করিয়ে ওঁকে খয়রাত করা হোক।

কতিপয় ছেলে কলকণ্ঠে কথাটার সমর্থনও করিল।

আভার সমস্ত মুখশ্রীতে একটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল।

একটু পরেই অধ্যাপক চৌধুরী কুণ্ঠিত পরিতোষের হাতখানি ধরিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ছেলেরা সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল।

অধ্যাপক কহিলেন,—ব'স তোমরা, ব'স। আমরা একটা কাযে জড়িয়ে পড়েছিলুম।

আভার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—পরিতোষকে কিছু খেতে দাও, মা। অনেক খেটেছে আমার সঙ্গে।

পরিতোষকে কহিলেন,—পরিতোষ ব'স।

পরিতোষ কহিল,—আপনি ব্যস্ত হবেন না, স্যার।

অধ্যাপক চৌধুরী আভাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—পরিতোষের একটা প্রস্তাব আজ আমাকে বড় আশান্বিত ক'রেছে, সেই জন্যই ছুটে এসেছি, মা। আমার ছাত্ররাও সবাই এখানে উপস্থিত, সকলের সামনেই সেটা ব'লছি।

সকলেই কথাটা শুনিতে কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

অধ্যাপক চৌধুরী কহিলেন,—আমাদের গবেষণা-ঘরখানা বাড়াবার

যে পরিকল্পনা ছিল, পরিতোষ নিজে তার ভার নিতে চায়। ওর প্রস্তাব এই যে, ডোনেস্থন তুলে যেমন ক'রে হোক আমাদের পরিকল্পনাটা সার্থক ক'রে তুলবে।—তোমরাও কথাটার আলোচনা ক'রতে পারো। আচ্ছা পরিতোষ, তুমি জল খাও, আমি ততক্ষণ কাপড়-চোপড় ছাড়ি।

অধ্যাপক মহাশয়ের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে অখিল তাহার মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল,—কিন্তু আমরা অন্য একটা প্রস্তাব ক'রছিলুম, পরিতোষ বাবু! আপনার নতুন প্রস্তাবে সেটা চাপা পড়ে গেল।

পরিতোষ কুণ্ঠিতভাবে এক পার্শ্বে বসিয়াছিল। সে কথাটার কোন উত্তর দিল না।

আভা খাবারের রেকাবখানি হাতে লইয়া অখিলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিল, তাহার পর আস্তে আস্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া পাত্রটি সসঙ্কোচে পরিতোষের সম্মুখে রাখিল।

অখিল বক্র দৃষ্টিতে পরিতোষের দিকে চাহিয়া কহিল,—স্যার আলোচনা ক'রতে ব'লে গেলেন, তাই ক'রছি। আচ্ছা, পরিতোষ বাবু, স্যারের স্কীমটা শেষ ক'রে তুলতে কত টাকার দরকার?

পরিতোষ মৃদুস্বরে কহিল,—অন্ততঃ পঁচিশ হাজার।

মুখে ব্যঙ্গের হাসি আনিয়া অখিল কহিল,—তবে আর ভাবনা কি, ভার যখন আপনি নিয়েছেন! পঁচিশ হাজার বই ত নয়, আপনার কাছে ও আর কি এমন!

পরিতোষ কহিল,—শ্রীরামচন্দ্রের সাগরবন্ধনে কাঠবিড়ালীও পাথর ব'য়েছিল, আমার চেষ্টাও এই রকম।

অখিল কহিল,—ভাবনা কি, শেষে গন্ধমাদনও বহন ক'রবেন। আভা এই সময় অতিশয় মুখখানি কঠিন করিয়া জলের গেলাসটি পরিতোষের দিকে আগাইয়া দিল। পরিতোষ হাতখানি ধুইয়া সবেমাত্র একটি মিষ্টান্ন

মুখে তুলিয়াছে, এমন সময় অখিল শ্লেষের সুরে তাহাকে কহিল,—আচ্ছা পরিতোষ বাবু, ডারউইন যে ব'লেছেন, বাঁদর থেকে মানুষ হ'য়েছে, একথা কি ঠিক্ ?

পরিতোষ পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর দিল,—বুঝতে পারছি না কোন্‌টা ঠিক, বাঁদর থেকে মানুষ হ'য়েছে, কিম্বা মানুষ ক্রমশঃ বাঁদর হ'য়ে পড়েছে।

পরিতোষের কথাটা আজ সকলকেই হাসাইয়া দিল, কেবল অখিল মুখখানা কালো করিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পরিতোষের দিকে চাহিল। পরিতোষ সহজভাবেই কথাটা বলিলেও অখিলের মনে হইল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই সে খোঁটাটা দিয়াছে। আভার দিকে চাহিতেও দেখিল, তাহার কঠিন মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে। আভার সমক্ষে এই পরাজয় তাহাকে অতিশয় উত্তেজিত করিয়া তুলিল, পরিতোষকে পুনরায় কি ভাবে আঘাত দিবে, এই চিন্তা তাহাকে অস্থির করিলেও কোনো নূতন কথা আজ আর সে আবিষ্কার করিতে পারিল না।

জলযোগ শেষ হইতেই পরিতোষ কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া পাঠাগারের দিকে চলিল।

অখিল তাহার দিকে ভ্রূকুটি করিয়া কহিল,—ইডিয়ট! ভদ্রতাও জানে না।

রমেন কহিল,—পালালো না বাঁচলো!

আভা মুখখানা ফিরাইয়া তাহার কাযে মনোযোগ দিল!

গবেষণাগারটি বাড়াইয়া ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিতে সাজাইয়া গবেষণা-কার্য্যে নিরত সুধীমণ্ডলীর সুবিধাবর্দ্ধন করিতে অধ্যাপক চৌধুরী ইদানীং বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ-জীবনের ইহাই প্রধান কাম্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ কার্য্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন,

তাহার কোনো সঞ্চয়ই তাঁহার ছিল না। অর্থ-সংগ্রহের আগ্রহ যখন তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলে, সেই সময় পরিতোষ তাঁহাকে আশ্বাস দেয়, অর্থ-সংগ্রহের দায়িত্ব সে স্বয়ং গ্রহণ করিবে।

এই সূত্রে প্রত্যেকের অন্তরেই বিস্ময়ের সহিত সংশয়ের রেখাপাত স্বাভাবিক। যাহার আচরণে বা চাল-চলনে আভিজাত্যের কোনোরূপ ছাপ পড়িতে কোনো দিন দেখা যায় নাই, পরিচ্ছদের দৈন্য ও প্রকৃতিগত কুণ্ঠা-সঙ্কোচ যে ছেলেটিকে স্বভাব-দরিদ্র বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে, ছাত্রসমাজ চাঁদা করিয়া যাহার পোষাক সরবরাহে লালায়িত, সেই দীনদরিদ্র ছেলেটিই অধ্যাপক চৌধুরীর পরিকল্পনাটি সার্থক করিতে অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে! সুতরাং স্যারের পরিকল্পনা ও পরিতোষের স্পর্দ্ধাকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ জটলাই চলিতেছিল।

আভা তাহার পিতার অন্তরের এই অতৃপ্ত কামনাটির কথা জানিত এবং প্রায়ই তাঁহাকে আশ্বাস দিত,—তুমি ভেবো না, বাবা, তোমার এ সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হবেই

পিতার মুখে যেদিন সে প্রথম শুনিল, পরিতোষ এত বড় দায়িত্বের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, সে বুঝি তখন ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পিতার মুখে কথাটা শুনিবার একটু পূর্ব্বেও সে অখিলের মুখে এই ছেলেটির দুরবস্থার কথা শুনিয়াছে! তথাপি মনে মনে সে এই দুঃসাহসী ছেলেটিকে অভিনন্দিত করিয়া ভগবানের নিকট তাহার সাফল্য প্রার্থনা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

পরিতোষের সম্বন্ধে অধ্যাপক চৌধুরীও মনে মনে এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, খুব ভালো ছেলে হইলেও সে দরিদ্রের সন্তান। পাছে বংশ-গত পরিচয়প্রসঙ্গে প্রশ্ন তাহার আত্মসম্মানে আঘাত দেয়, সেই জন্য তিনি

এ বিষয়ে নীরব থাকিতেন। কিন্তু তিনি নীরব থাকিলেও এই প্রিয়দর্শন স্বল্পভাষী ছেলেটির চলার পথের গতিবিধির সন্ধান লইতে আভার কৌতূহল সময় সময় উদ্রিক্ত হইয়া উঠিত। সে দিনের ঘটনার পর সে সাগ্রহে সেই সুযোগটুকুর প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাহা সম্ভব হইয়া উঠিল।

অধ্যাপক চৌধুরী পরিতোষকে তাঁহার কোনো গবেষণার একটা বিষয় লিখিতে দিয়াছিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের পেনসিলে লিখা অস্পষ্ট ও বিক্ষিপ্ত নোটগুলি স্পষ্টাক্ষরে সাজাইয়া লিখিয়া একটু অসময়েই সে এই দিন তাঁহার বাসায় আসিয়াছিল। আভা সে সময় পিতার পাঠাগারটির ভিতর ছিল। প্রতিদিনই ঠিক এই সময় পিতার প্রকাণ্ড টেবলের উপর বিশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত কেতাব ও কাগজপত্রগুলি সে স্বহস্তে গুছাইত, আজও গুছাইতেছিল।

পরিতোষ ঘরের ভিতরেই আসিতেছিল, কিন্তু আভাকে দেখিয়া দ্বার-দেশে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পদশব্দে আভা পিছন ফিরিয়া চাহিতেই উভয়ে চোখাচোখি হইল। প্রায় দুইটি বৎসর ধরিয়া পরিতোষ এই বাড়ীতে আসিতেছে, প্রতিদিন এই ঘরে বসিয়াছে, প্রফেসরের পিছু পিছু কত দিন বাগানে ঘুরিয়াছে, গাছের কথায় কত কথাই হইয়াছে এবং এমন একটি দিনও বোধ হয় অতীত দুইটি বৎসরের মধ্যে দেখা দেয় নাই—এই মেয়েটির পরিচর্য্যা ও পরিবৃতির প্রভাব যাহার উপর না পড়িয়াছে। কিন্তু এই দুইটি তরুণ-তরুণী এতদিন পরে ক্ষণিকের এই আকস্মিক দৃষ্টির ভিতর দিয়াই কি পরস্পরকে দেখিল ও এই তীক্ষ্ণ মধুর দৃষ্টির প্রভাব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল ?

নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত দুইখানি যুক্ত করিয়া পরিতোষ মাথায় ঠেকাইতেই আভার চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি প্রতিনমস্কার করিয়া লজ্জাবিজড়িত কণ্ঠে কহিল,—আসুন।

আভা ভাবিয়া পাইল না, এ লজ্জা কেন ? অপর কোনো ছাত্রকে এরূপ সম্ভাষণ করিতে তাহার জিহ্বা ত লজ্জাড়ষ্ট হয় নাই কোনো দিন !

পরিতোষ অতিশয় সঙ্কুচিত ভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল এবং একখানি চেয়ার টানিয়া তাহাতে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল ।

আভা একটিবার বক্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই আলমারির ভিতরে রক্ষিত একখানা কেতাবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। এই ছেলেটিকে কত প্রশ্ন করিবে বলিয়া সে মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়া-ছিল, কিন্তু তাহার একটিও ত সে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না ! পিতার অন্যান্য ছাত্রের সহিত অসঙ্কোচেই ত অনেক কথাই সে কহে, কত প্রসঙ্গ লইয়া তুমুল কথা-কাটাকাটিও চলে ! অথচ, এই ছেলেটি আজ একাই তাহার সম্মুখে বসিয়া আছে, কিন্তু সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না—আপনার দেশ কোথায় ? বাড়ীতে আর কে কে আছেন ? আর—আর—

চেয়ারে বসিয়া পরিতোষও ঘামিয়া উঠিতেছিল, সেও বুঝি এই মেয়েটিকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য জিহ্বার সহিত যুদ্ধ বাধাইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে বার-দুই কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার ও মনটার ভিতর শক্তির সঞ্চার করিয়া সে এই কয়টি কথা বাহির করিয়া ফেলিল,—স্যার কি এখন নীচে আসবেন ?

আভা তাহার বদ্ধ দৃষ্টিটা আলমারির কেতাবখানার উপর হইতে তুলিয়া পরিতোষের দিকে ফেলিতেই আবার তাহাদের চোখাচোখি হইয়া গেল ; সে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল,—তিনি বাইরে গেছেন, এখুনি ফিরবেন ।

পরিতোষের সাহস বাড়িতেছিল, পুনরায় সে কহিল,—আমি বোধ হয় অনেকটা আগেই এসেছি ।

আভা এবার টেবলখানার দিকেই ফিরিয়াছিল এবং চক্ষুকে আকৃষ্ট

করিবার মত উপাদান সেখানে যথেষ্টই ছিল। প্রফেসরের ফাউণ্টেন পেনটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে সে কহিল,—আপনার ত আজ এই সময়েই আসবার কথা ছিল। বাবা বেরুবার সময়ও আপনার কথা ব'লছিলেন।

পরিতোষের চিত্তটি দুলিয়া উঠিল, কিন্তু ইহার পর কি কথা সে কহিবে, তাহা খুঁজিয়া পাইল না। মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া চাহিতেও পারিতেছিল না, যদি পুনরায় মেয়েটির দুইটি আয়ত চক্ষু সহিত তাহার দৃষ্টির সংঘাত হয়! অগত্যা সে পকেট হইতে কাগজের তাড়াটি বাহির করিয়া তাহাতেই মনঃসংযোগ করিল।

আভা আড়-নয়নে তাহা দেখিল এবং তাহার পর ঠোঁটের উপব হাসি ফুটাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—কি পড়ছেন? কবিতা?

পরিতোষ উত্তর দিল,—না; স্যারের নোট নকল ক'রে এনেছি।

আভা কহিল,—আশ্চর্য্য! বাড়ীতে ব'সেও এত খেটেছেন। আমি ভেবেছিলুম, বুঝি কবিতা লিখে এনেছেন।

পরিতোষ এবার একটু হাসিয়া কহিল,—আমার ও ক্ষমতা মোটেই নেই। কবিতা পড়ি, কিন্তু লিখতে পারি না।

আভা কহিল,—এই জন্যই বুঝি আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে মন খুলে আপনি মিশতে পারেন না?

পরিতোষ কহিল,—যোগ্যতার অভাবই আমাকে মিশতে বাধা দেয়।

কথাটা আভার বুকে বাজিল, ব্যথিত-কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল,—যোগ্যতার যাচাই আপনি কি দিয়ে করেন?

পরিতোষ সহসা কথাটার উত্তর দিতে পারিল না, দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া চাহিতেই সে দেখিল, প্রশ্নকারিণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার দিকেই নিবদ্ধ। মনে মনে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি অনুভব করিয়া পরিতোষ উত্তর দিল,—নিজের দৈন্যের দিক্ দিয়েই এটা অনুভব করা যায়।

আভার মুখে এবার উত্তেজনার আভা পড়িল, কণ্ঠস্বর কঠিন করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—দৈন্য আর অক্ষমতা কি এক বস্তু? দৈন্য দিয়েই কি অক্ষমতাকে জয় করা যায় না?

পরিতোষ কহিল,—যায়, যদি প্রতিভা থাকে; কিন্তু আমি যে ওতেও বঞ্চিত।

আভা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর আস্তে আস্তে কহিল,—কিন্তু বাবার মুখে আপনার সুখ্যাতি শুনেছি।

পরিতোষ গাঢ়স্বরে কহিল,—ওটা ওঁর স্বভাব, নির্গুণের মধ্যেও উনি গুণের সন্ধান করেন, দীনকেও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন।

আভার চিত্তটি পুনরায় দুলিয়া উঠিল। এই ছেলেটির প্রতি কথাটি তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিতেছিল। নিজের প্রশংসায়ও ইহার ভ্রূক্ষেপ নাই, এই পাওনাটুকুও যেন অন্যের উপর চাপাইতে পারিলেই সে বাঁচে।

বাহিরে অনেকগুলি পদশব্দের সহিত বহু কণ্ঠের কলরবে বাড়ীখানা বুঝি মুখর হইয়া উঠিল।

আভা আপনাকে সামলাইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া কহিল,—আপনার বন্ধুরাও উপস্থিত।

অখিল দ্বারদেশ হইতে মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল, এবং আপনাদের উভয়ের বিশ্রম্ভালাপে বিঘ্নও উপস্থিত!

কক্ষমধ্যে উপস্থিত দুইটি প্রাণীর মুখশ্রীই বুঝি যুগপৎ আরক্তিম হইয়া উঠিল। পরিতোষ কোনো দিকে না চাহিয়া তাহার হাতের কাগজে মনঃসংযোগ করিল, আভা কথাটার কোনো উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া নমস্কারের ভঙ্গীতে শুধু কহিল,—আসুন।

ছেলেগুলি প্রত্যেকেই আভাকে প্রতিনমস্কার জানাইয়া এক একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। ইহারা প্রত্যেকেই বুঝি ওষ্ঠপ্রান্তে ঈর্ষ্যা-

মিশ্রিত হাসি ও দৃষ্টিতে বিদ্রূপ ভরিয়া পাঠনিরত পরিতোষের দিকে চাহিয়াছিল।

অখিল সহসা প্রশ্ন করিল,—পরিতোষ বাবু নিবিষ্ট মনে ওগুলোর ভেতর থেকে কি আহরণ ক'রছিলেন?

পরিতোষ মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল,—ভদ্রতা আহরণ ক'রছি।

রমেন কৃত্রিম বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—পুঁথির পাতা থেকে?

পরিতোষ কহিল,—মানবদেহে ও-বস্তুটির অভাব হ'লে পুঁথির পাতা থেকে ওকে আহরণ ক'রতে হয়।

অখিল কহিল,—নিশ্চয়, পরিতোষ বাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি, উনি ভাল-রকমেই বুঝেছেন কোথায় অভাব এবং কি তার জন্য প্রয়োজন।

আভা একটু হাসিয়া কহিল,—কিন্তু জ্ঞানীরা নিজের জন্যই কিছু আহরণ করেন না, তাঁদের সঞ্চয় পরার্থে।

অখিল কহিল,—কিন্তু যারা বুদ্ধিমান্, তাদের দৃষ্টি আত্মস্বার্থে।

আভা কহিল,—এ কথা পরিতোষ বাবুর সম্বন্ধে খাটে না, যেহেতু আপনারা কোনো দিনই ওকে বুদ্ধিমান্ বলেন নি।

অখিল স্বরটা সহসা একটু চড়াইয়া কহিল,—এই ভদ্রলোকটির হ'য়ে আপনার এভাবে ওকালতী কি জন্য?

আভা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—ভদ্রতার অনুরোধে।

অখিল বিদ্রূপের সুরে কহিল,—উনি ক'রছেন ভদ্রতা আহরণ, আর তার বিতরণ-ভার বুঝি আপনিই গ্রহণ করেছেন?

আভা কহিল,—এ প্রসঙ্গটা তেতো হ'য়ে গেছে, অখিল বাবু, নেবু প্রথম বারই নিঙ্‌ড়ানো উচিত, তার পর সেটা পরিত্যাজ্য। আর কোনো কথা থাকে ত পাড়ুন।

অখিল মুখখানা অন্ধকার করিয়া মনে মনে ভাবিল,—ছোট

একটি কথা বলিয়া গভীর নিস্তব্ধতা আশ্রয় করিয়া কি পরিতোষ জয়ী হইল ?

উদয় এই সময় প্রশ্ন করিল,—পরিতোষ বাবু, স্যারের স্কীমটা কতদূর এগোলো ? কত টাকা তুললেন ?

রমেন কহিল,—চাঁদার খাতাখানা আমাদের সামনে তুললেনও না, গরীব হ'লেও আমরা তাতে কালী-কলমের একটা আঁচড়ও ত কাটতুম।

সুবোধ কহিল,—কাগজেও কিছু বেরোয়নি ত! কি ক'রছেন তা হ'লে ?

পরিতোষ শান্তস্বরে উত্তর দিল,—চেষ্টা ক'রছি।

অখিল কহিল,—কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারছি না, আজই স্যারকে জানাবো যে, আমরাও চেষ্টা ক'রতে পারি শুধু তাই নয়, অনেকটা এগোতেও পারি।

আভা কহিল,—বেশ ত, এ নিয়ে ঝগড়ার ত কোনো প্রয়োজন নেই, বাবা এলে তাঁকে বলবেন।

এই সময় বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিযা উঠিল, আভা গবাক্ষ-পথে বাহিরের দিকে চাহিযা কহিল,—বাবা এসেছেন।

একটু পরেই অধ্যাপক চৌধুরী পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন এবং সমবেত ছাত্রমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিযা কহিলেন,—এই যে, তোমরা এসেছ! ভালোই হ'য়েছে। ব'স, ব'স,—আভা, তুমিও ব'স, মা।

অধ্যাপক মহাশয় আসিতেই সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি নিজের আসনে উপবিষ্ট হইতেই সকলে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিল।

অখিল সহসা কহিয়া উঠিল,—স্যার, আমার একটা কথা আছে।

এ কথায় সকলেরই চক্ষু তাহার দিকে আকৃষ্ট হইবার কথা। আভা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অখিলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহাতে একটা

প্রচণ্ড অহঙ্কারের ছায়া পড়িয়াছে। সে দৃষ্টি ফিরাইয়া পিতার দিকে তাকাইতে দেখিল, তিনিও এই ছেলেটির দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন।

অখিল গর্ব্বিত-কণ্ঠে কহিল,—আপনার সেই স্কীমটার সম্বন্ধে ভার ও দায়িত্ব নিয়ে পরিতোষবাবু কতদূর কি ক'রেছেন জানি না, কিন্তু আপনার এই অক্ষম ছাত্রটি ভার না পেয়েও কথঞ্চিৎ কায ক'রেছে, স্যার!

স্যার সহাস্যে কহিলেন,—বটে!

অখিল এবার কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ পর্দ্দায় তুলিয়া এবং পরিতোষের দিকে একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া কহিল,—আমি আমার বাবার কাছে প্রস্তাবটা পাঠিয়েছিলুম, স্যার। তাঁকে এ কথাও জানিয়েছিলুম যে, তিনি যথাসাধ্য করুন এবং জমিদারীর প্রজাদের কাছ থেকেও চাঁদা তুলুন। আমার সেই চিঠির জবাব এসেছে, বাবা জানিয়েছেন, তিনি যেমন কোরে হোক হাজার টাকা তুলে দেবেন।

কথাটা শেষ করিয়াই সে পুনরায় পরিতোষের দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিল, এতবড় সংবাদটা তাহার নির্ব্বিকার মুখে কোনরূপ পরিবর্ত্তন আনিতে পারে নাই।

অধ্যাপক চৌধুরী মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—তোমার সহৃদয় পিতার এই প্রচেষ্টার জন্য আমার ধন্যবাদ তাঁকে জানিয়ো, অখিল; কিন্তু বোধ হয় তাঁর সাহায্য উপস্থিত প্রয়োজন হবে না।

অখিল স্তব্ধ হইয়া গেল, ইহা সে প্রত্যাশাও করে নাই।

অধ্যাপক চৌধুরী কহিলেন,—এই মাত্র তুমি তোমার কথায় প্রকাশ ক'রেছ অখিল, ঐ কাযটার ভার ও দায়িত্ব নিয়ে পরিতোষ কতদূর কি ক'রেছে, তুমি জান না। ঘণ্টা দুই আগে আমিও জানতুম না। এখন আমি সেটা তোমাদের কাছে প্রকাশ ক'রে সত্যই অবাক্ ক'রে দেব।

পরক্ষণে তিনি নতমুখে পরিতোষকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—তুমিও বাদ পড়বে না, পরিতোষ। তোমাকেও শুদ্ধ হ'তে হবে—এখনি যে-পরিচয় তুমি পাবে।

কাহারও মুখে কথা নাই, এখন প্রত্যেকের দৃষ্টি অধ্যাপক চৌধুরীর কৌতুকোজ্জ্বল সুপ্রসন্ন মুখখানির উপর।

অতঃপর অধ্যাপক চৌধুরী তাঁহার লম্বা পিরাণটির পকেট হইতে একখানি দীর্ঘ লেফাফা বাহির করিলেন। তাহার অঙ্গে লাল রঙ্গের কয়েকখানি টিকিট ও সেগুলির উপর পর পর ডাক-ঘরের কয়েকটী মোহর অঙ্কিত।

লেফাফার ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া অধ্যাপক চৌধুরী কহিলেন,—কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই, এই চিঠিখানা আমি পড়ছি, তোমরা শুনলেই আমার বক্তব্য বিষয়টা বুঝতে পারবে।

অতঃপর তিনি চিঠিখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।—

প্রিয় সুবিনয়,

প্রায় ষোল বৎসর, যে ছাপানো পত্রখানি আমাদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়াছিল, আজ তোমারই ছাত্র পরিতোষ তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এবং তাহাতেই পূর্ব্ব-পরিচয়ের রুদ্ধ স্রোত পুনরায় মিলনের খাতে বহিয়াছে,—যদিও ইহার মূলতত্ত্ব এ পর্য্যন্ত পরিতোষের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

শৈশব হইতেই এই মাতৃহীন শিশুটির প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। যে অবস্থায় আর দশ জন ছেলে লাফাইয়া বড় হইতে চায়, সব বিষয়েই বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করিয়া বড় মানুষ সাজে, পরিতোষ সেখানে ঐ বড়মানুষীকে দুই হাতে ঠেলিয়া গরিবিয়ানার পরিচয় দিতে ভালবাসে। সে যে-ঘরের ছেলে, তাহাতে তাহার পক্ষে সহরে স্বতন্ত্র বাড়ী, ঘরের গাড়ী, লোক জন রাখিয়া পাঠাভ্যাস করিবার কথা, কিন্তু সে কাহারও কথার তোয়াক্কা না রাখিয়া

সাধারণ মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করে। আমার আপত্তির উত্তরে সে সবিনয়ে জানাইয়াছে—ছাত্রজীবনে ঐ সকলের কোনো সার্থকতা নেই, তাহাতে শুধু অহমিকাই প্রশ্রয় পায়। সুতরাং তাহার মত চাপা প্রকৃতির ছেলে যে তাহার বংশপরিচয় তোমাকে দেয় নাই এবং তুমিও যে তাহাকে এ পর্য্যন্ত অপরিচিতের পর্য্যায়ে ফেলিয়া রাখিয়াছ, সে বিষয়ে আমার সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

হঠাৎ তাহার একখানা পত্র পাইলাম, অতিশয় সংক্ষিপ্ত পত্র। কিন্তু তাহার বিষয়বস্তুটা সুস্পষ্ট। তোমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য পাইয়া প্রযোজনীয় অর্থ টা গুরুদক্ষিণা সূত্রে সে দাবী করিয়াছে এবং ইহাও অনুরোধ করিয়াছে, ইহার কোনো অংশ যেন দরিদ্র প্রজাদের কষ্টার্জ্জিত সঞ্চয হইতে আহৃত না হয, তাহা হইলে তাহার গুরুর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এই পত্রে শ্রীমান্ আর একটি কথা লিখিয়াছে,—'এই মণীষীর চরণতলে বসিয়া জ্ঞানের পিপাসা মিটাইবার সময় আপনারই স্নেহের পরশ পাই!' ইহা কি তাহার অন্তর্নিহিত অনুভূতি?

এই পত্রমধ্যে হাজার টাকার পাঁচ কেতা নোট ও ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের উপর কুড়িহাজার টাকাব একখানা চেক আছে। শ্রীমান্ পরিতোষের গুরুদক্ষিণা। প্রেমিক বন্ধুর চিত্তের সাধনা সার্থক হইলে বিজয়ী বন্ধু ধন্য হইবে।

অভিন্ন

শ্রীআশুতোষ রায়।

কাহারও মুখে কথা নাই, স্তব্ধ হইয়াই প্রত্যেকে এই পত্রখানার প্রতি ছত্র শুনিতেছিল।

সহসা অধ্যাপক চৌধুরী চিঠির উপর হইতে তাঁহার বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি তুলিয়া কহিলেন,—এই পরিতোষের মত পরিতোষের বাবাও পত্রে তার

পরিচয় খুলে দেয় নি। সেটা আমিই বলছি,—রাজপুর এষ্টেটের নাম তোমরা নিশ্চযই শুনেছ। এমন নির্দ্দায এষ্টেট বাঙ্গালায় অল্পই আছে। বার্ষিক মুনাফা প্রায় আড়াই লাখের কাছাকাছি। এই আশুতোষ রায় এই এষ্টেটের মালিক। আর পরিতোষ সেই সম্পত্তিব ভাবী উত্তরাধিকারী। এবার আমাদেব সম্বন্ধের কথাও বলি, সে যেন একটা রোমান্স!

অখিলের মুখখানা যতই বিবর্ণ হইতেছিল, সে ততই জোর করিযা তাহাতে ভাবেব সঞ্চার করিতেছিল। অন্যান্য ছেলেদের মুখে বিস্ময়ের সহিত শ্রদ্ধার চিহ্ন ফুটিতেছিল। অধ্যাপকের পরবর্ত্তী কথা শুনিতে তখনও তাহাদের সমান আগ্রহ।

অধ্যাপক মহাশয কহিলেন,—পরিতোষেব বাবা আমার সতীর্থ, এক সঙ্গে প্রেসিডেন্সীতে পড়েছি; কতবার ওদের বাড়ীতে গেছি। আশুর বিবাহে আমিই ছিলাম প্রধান পাণ্ডা, আবার আমার বিয়েতে ঐ আশুই হ'য়েছিল মোড়ল। দুটী তরুণী বধূও বন্ধুদের সম্প্রীতি বরণ ক'রে নেন। দু'জনে কি সদ্ভাবই ছিল! এক মাসের ব্যবধানে যেন দুজনে পরামর্শ ক'রেই পরলোকের পথে পাড়ি দিযেছিল। আমি তখন পাটনা কলেজে পোষ্টেড হ'যেছি। তার পরই আমাদের ছাড়াছাড়ি আর খোঁজ খবর ছিল না।

কথার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক মহাশয়ের কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া আসিল, চক্ষু-পল্লবগুলিও বুঝি সিক্ত হইতেছিল, তাড়াতাড়ি রুমালখানি বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে তিনি মনের এই দুর্ব্বলতাটুকু চাপা দিতে প্রয়াস পাইলেন।

আভা ও পরিতোষ এই অবসরে পরস্পরের দিকে চাহিল, তাহাদের চক্ষুপল্লবগুলিও একেবারে শুষ্ক ছিল না।

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই; আভা-ই এই নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিল। প্রসঙ্গটি তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াও যে সংশয় তুলিতেছিল, তাহাই

সে ব্যক্ত করিল। পিতার মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল,—তা হ'লে আমাদের মায়েরাই আপনাদের সদ্ভাবের যোগসূত্রটি বজায় রেখেছিলেন বলুন। তাঁদের অভাবেই ওটা ছিঁড়ে যায়?

অধ্যাপক চৌধুরীর মুখের উপর একটা কালো ছায়া পড়িল, কণ্ঠের স্বরও বুঝি তাহার প্রভাব কাটাইতে পারিল না। একটু অস্বাভাবিক স্বরেই তিনি কহিয়া উঠিলেন,—ঠিক, ঠিক, জেরাটা তোমার অন্যায় হয় নি, মা। কিন্তু কেন যে ওটা সম্ভব হ'য়েছিল, সে কথা তুলতে গেলে পরিতোষকে হয় ত আঘাত দেওয়া হবে।

আভা পরিতোষের দিকে চাহিতেই সে সহজকণ্ঠেই কহিল,—আঘাত সহ্য ক'রবার মত শক্তি আমার আছে, স্যার। আপনি বলুন।

অধ্যাপক চৌধুরী কণ্ঠের স্বর বেশ গাঢ় করিয়াই কহিলেন,—আমরা দুজনেই সে সময় শোকে অভিভূত হ'য়ে পরস্পরকে সমবেদনা জানিয়েছিলুম। আমি আশুকে লিখি, যে-কুসুম-কোরকটি সে রেখে গেছে, তাকে গুণে-গন্ধে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ক'রে তোলাই হবে আমার অবশিষ্ট জীবনের সাধনা। আশুও লিখেছিল এবং তার সেই কথাগুলো এখনো আমার মনে আছে—খোকার দিকে চাইলে তার স্মৃতি যেন জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে, এইটুকুই আমার সান্ত্বনা। এই চার বছরের শিশুটিকেই বুকে ক'রে আমি ক'রব তার স্মৃতিপূজা।—কিন্তু বলতে আমি এখনো ব্যথা পাচ্ছি, এর মাস দেড়েক পরেই শুভ বিবাহের মার্কা-মারা নেমন্তন্নর এক চিঠি এল আমার নামে, তার তলায় আশুর বিধবা মায়ের নাম ছাপা। সেই সঙ্গে আশুর নিজের হাতে লেখাও এক সংক্ষিপ্ত চিঠি, তাতে সে জানিয়েছিল—'ছেলেটার মুখ চেয়ে আর মায়ের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই এতে সায় দিতে হ'য়েছে। তুমি এতে যোগ না দিলে অত্যন্ত ব্যথা পাব।' সেদিন আমার মনের অবস্থা কথায় তোমাদের বোঝাতে পারব না,

চিঠিখানা বুঝি আমার জীবনের রসটুকু সমস্তই শুষে নিয়েছিল, আমার মনে আছে, সেদিন আমি খাই নি, ঘুমুই নি, কোনো বিষয়েই চিত্ত নিয়োগ ক'রতে পারি নি—

পরিতোষ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে অধ্যাপকের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—সে পরিচয় আপনার বর্ত্তমানের অবস্থা থেকেই পাচ্ছি।

অধ্যাপক মহাশয় স্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া কহিলেন,—সেই থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি। এতকাল পরে পরিতোষই আবার মিলন-গ্রন্থি পরিয়ে দিলে।

পরিতোষ এই সময় অতিশয় মৃদুস্বরে কহিল,—কিন্তু স্যার, যিনি আপনাদের বিচ্ছেদের হেতু হ'য়েছিলেন, আমার সেই অভাগিনী নতুন মা'টির জীবন একটি বৎসরও স্থায়ী হয় নি।

অতি বিস্ময়ে অধ্যাপক কহিলেন,—বল কি! আশুর সেই স্ত্রী বেঁচে নেই? এ আঘাতও সে বুক পেতে সহ্য ক'রেছে?

পরিতোষ কহিল,—সেই থেকে তাঁরও সাধনা চ'লেছে, স্যার, সন্ন্যাসীর মত। সর্ব্ব সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে সর্ব্বসাধারণকে তিনি স্নেহ দিয়ে আপনার ক'রে নিয়েছেন। এখন মনে অনুতাপ হ'চ্ছে যদি এ পরিচয়—কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না এবং আভাও ঠিক এই সময় পরিতোষের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিয়া উঠিল,—আপনার এই প্রকাশ ও পরিচয় যদি পূর্ব্বেই আপনি জানিয়ে দিতেন, তা হ'লে বন্ধুরা কবিতা রচনার এমন মনোরম প্লটটা কখনই পেতেন না।

কথাটা শেষ করিয়াই সে অখিল ও অন্যান্য ছেলেগুলির উপর দিয়া তাহার দৃষ্টিটা বুলাইয়া লইল।

পরিতোষ মুখখানা নীচু করিয়া একটু হাসিল, কোনো উত্তর দিল না।

অধ্যাপক চৌধুরী সহসা সুপ্তোত্থিতের মত আর্দ্র স্বরে কহিলেন,—জগতের অনেক প্রকাশ এমনই আকস্মিকভাবে হ'য়ে থাকে মা! ছোট একটা সূত্র তার উপলক্ষ হয়। আমরাও এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার ক'রব। আমাদের পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানটি সেই দুই স্বর্গগতা সাধ্বীর স্মৃতি-বিজড়িত ক'রে পরিতোষের গুরুদক্ষিণা সার্থক ক'রবো।

নিয়তি

এক

পাসের খবর সকলকেই স্তব্ধ করিয়া দিল।

স্তব্ধ হইবারই কথা। কুলীনপুর হাইস্কুল হইতে যে কয়টি ছেলে এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কাহারও নাম গেজেটে উঠে নাই; অথচ নূতন মেয়ে-ইস্কুল হইতে যে একটি মাত্র মেয়ে এ বৎসর এই প্রথম 'য়্যাপিয়ার' হইয়াছিল, গেজেটের প্রথম বিভাগের তালিকায় তাহার নামটি ছাপিয়া বাহির হইয়াছে।

এই মেয়েটির নাম আশা। পিতার নাম নিবারণ গাঙ্গুলী। ইনিও কুলীনপুরের অধিবাসী। এই বিশাল গ্রামখানির আশ্রয়ে প্রায় তিন শত ঘর স্বভাব-কুলীন স্মরণাতীত কাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছেন এবং প্রত্যেকেই প্রাণপণ প্রয়াসে কৌলীন্যের এই অবদানটুকু উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত নানা স্থানে তালি দেওয়া জীর্ণ শাল-দোশালার মত সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া সমাজে আপনাদিগকে একটা বিস্ময়ের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন।

অতীতের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে ভাবেই অঙ্কিত থাকুক না কেন, বর্ত্তমানের কথা আলোচনা করিলেই জানা যায় যে, ছেলে আসিলেই শাঁখ বাজে, প্রসূতির উদ্দেশে প্রশস্তি উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৌলীন্যের মর্য্যাদা সূতিকাগারেই সুস্পষ্ট হইয়া ভবিষ্যতের লাভের অঙ্কটি ছবির মত আঁকিয়া দেখায়। কিন্তু, ছেলের বদলে যদি মেয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়? অমনই সারা বাড়ীখানা ঘিরিয়া ঘনাইয়া উঠিবে নিবিড়তম বিষাদের মালিন্য, বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধবনিতার চোখে-মুখে প্রকাশ পাইবে

অপ্রসন্নতার নানারূপ চিহ্ন ; শাঁখ বাজিবে না, উলুধ্বনি শোনা যাইবে না, মনে হইবে একটা অবাঞ্ছিত অভিশাপ বুঝি মেয়ের মূর্ত্তি ধরিয়া আঁতুর ঘরে আসিয়াছে !

মেয়ের সৃষ্টিতত্ত্ব যেখানে এই সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করে, মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি সেখানে কতটুকু সম্ভব হইতে পারে? রক্ষণশীল সমাজ কৌলীক স্বার্থ ও চিরান্তস্থত সংস্কার রক্ষা করিতেই ব্যস্ত। ছেলেদের সকল বিষয়েই সাত খুন মাপ এবং সকল দিক দিয়া মেয়েদের খাটো করিয়া রাখিতে সযত্ন-প্রসূত সতর্ক প্রয়াস। কিন্তু কালের প্রবাহ কতকাল প্রতিরোধ করিতে পারা যায় ?

প্রগতির দুর্ব্বার গতি এই গ্রামেও অতঃপর উদ্দাম হইয়া ঢুকিয়াছে। রক্ষণশীলের দল প্রবল বাধা দিয়াও তাহার স্রোত রুদ্ধ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সকল আপত্তি এবং বৈধ-অবৈধ যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা কাটাইয়া গ্রাম্য প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়টি হাইস্কুলে পরিণত হইয়াছে। ছেলেদের সহিত পাল্লা দিয়া ইংরিজী শিখিয়া পাছে মেয়েরা গোল্লায় যায়—এই আশঙ্কায় কুলীনপাড়ার মেয়েদিগকে আটকাইবার কম চেষ্টাই কি সমাজ-পতিরা করিয়াছেন? কিন্তু ইঁহাদেরই পাড়ার ঢেঁকী নিবারণ গাঙ্গুলী হঠাৎ দল ছাড়া হইয়া নিজের মেয়েটিকেই সর্ব্বাগ্রে নূতন বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সেদিন তাঁহাদিগকে যেমন অবাক করিয়াছিল, বছর কতক পরে আবার তাহারই মেয়ে যে এই বিদ্যালয় হইতেই সাফল্যের জয়টিকা পরিয়া কুলীন কুলের মুখগুলি কালো করিয়া দিবে—ইহা কি তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন ?

কালের প্রবাহ দীর্ঘ সাতটি বৎসরে যে পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, তাহাতে রক্ষণশীলদের তথাকথিত বিস্ময়ের সহিত ঈর্ষারও যে প্রচুর সংস্রব রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেন না, বর্ত্তমানে অনেকগুলি কুলীন-

কন্যাও অন্ধ সংস্কারের ঘুলঘুলি হইতে বাহির হইয়া নূতন বিদ্যালয়ের সংস্রবে আসিয়াছে এবং এই আসাটাই এখন সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু নিবারণ গাঙ্গুলী তথাপি সমাজপতিদের বিচারে বেকসুর অব্যাহতি পাইলেন না। সাতবৎসর পূর্ব্বে সমাজের বিরুদ্ধে যে বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করিয়াছিলেন, সমাজপতিগণ এতদিন পরে তাহারই প্রতিবিধানে তৎপর হইলেন।

দুই

বয়স, বুদ্ধি ও বৃত্তি এই তিনটির জোরে কুলীনপাড়ার যে কয়টি সুবিধাবাদী মাতব্বর অনেকদিন ধরিয়াই সমাজের মাথার উপর বসিয়া মোড়লী করিয়া আসিতেছেন, বছর কতক আগে নিবারণ গাঙ্গুলীও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐ তিনটি দুর্লভ নিধির গর্ব্ব তিনিও করিতেন। কিন্তু একটি মেয়েকে পার করিতেই তাঁহার গৌরবের শেষেরটি খর্ব্ব হইয়া পড়ায় প্রথম দুইটির প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাটুকু হারাইয়া বসিয়াছেন। বৃত্তিহীনের শক্তি কোথায় যে সমাজ শাসন করিবে? কাজেই নিবারণ গাঙ্গুলী বুদ্ধিমানের মত তাঁহার অধিকৃত স্থানটুকু ছাড়িয়া দিয়া মানে মানে সরিয়া আসিয়াছেন।

কাল হইয়াছিল তাঁহার কন্যার বিবাহ। কুলীনপাড়ার সেরা কুলীন তিনি, বেগের গাঙ্গুলী; সমাজের মাথা; পৈতৃক ঘর-বাড়ীর অবস্থাও মন্দ নয়। সরকারী দপ্তর হইতে সোত্তর টাকা পেন্সন পান, বড় ছেলেকে ঐ দপ্তরেই ঢুকাইয়া দিয়াছেন, সেও মাসে আশী টাকা উপায় করে,—সুতরাং তাঁহাকে পায় কে? এক্ষেত্রে মেয়েকে কি যেমন তেমন ঘরে দিতে পারা যায়,—এবং এই ব্যাপারে তাঁহার নাম-ডাকের মত ঘটা ও ব্যয়-বাহুল্য না করিলেই বা লোকে বলিবে কি?

কিন্তু গাঙ্গুলী মহাশয়দের নাম-ডাক যতই থাকুক, পুঁজি-পাটা সে অনুপাতে বিশেষ কিছু ছিল না। নাম বাজাইতে গেলে ব্যয় কমাইতে পারা যায় না, ইঁহারাও পারেন নাই। ভাল ঘর ও বর দেখিয়া মেয়ে দিতে হইলে ভাল রকম অঙ্কের টাকাও তো চাই। তখন ছেলের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজের পেনসনের পরিমাণ অনেকটা খর্ব্ব করিয়া নিবারণ গাঙ্গুলী সরকারী সেরেস্তা হইতে হাজার তিনেক টাকা লইযা মেয়েকে পাত্রস্থ করিতে কোমর বাঁধিলেন।

কিন্তু টাকার যোগাড় তাঁহার পক্ষে যত সহজ হইল, পাত্রের ব্যাপারটি ততোধিক দুরূহ হইয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। ভাল ঘর মিলে ত, বর হয় যাচ্ছেতাই; আবার ছেলে যেখানে ভাল হয়, তাহার দুরবস্থা সেখানে পিছাইয়া দেয়। দুইটিই যদি বা মনোনীত হয়, কৌলীন্য মর্য্যাদার নানারূপ নির্দ্দেশ তাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত করে। কুলীন হইলেও কি নিস্তার আছে,—যদি তাহার কৌলীন্যে কিছু দাগ থাকে—তবে? সর্ব্বনাশ! শেষে কি কন্যা দিয়া ঐ দাগ তাঁহারও কুলে দাগিয়া দিবেন? কাজেই, কুল সম্বন্ধে যেখানে এত কশাকশি, কেমন করিয়া সেখানে সকল বিষয়ে প্রিয়দর্শী পাত্র মিলিতে পারে?

অনেক দেখাদেখির পর একটি পাত্র অগত্যা গাঙ্গুলী মহাশয়ের মনে ধরিল। তাঁহাদেরই পালটি ঘর, ফুলের মুখুটী; কুলে কোন দোষ নাই; শ্রীরামপুরে বাড়ী, বাপ মা ও পাঁচটি ভাই বর্ত্তমান, এই ছেলেটিই বড়; যদিও কোনো পাস করিতে পারে নাই, কিন্তু রেলের আফিসে সুপারিসের জোরে একটা ভাল রকমের চাকরী যোগাড় করিতে পারিয়াছে, বেতনের পরিমাণ এখন পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু কালে তাহা পঁচাশীর কোঠায় উঠিবে, এরূপ সম্ভাবনা আছে। বয়স একটু বেশী, আটাশের নীচে নয়; চেহারার কথা না তোলাই ভাল, কেন না— কুলীনের কুলটাই এদিকটা নাকি আলো

করিয়া রাখে ; সেই জন্য বিবাহ ব্যাপারে এই অংশটা উহ্যই থাকে, শুধু এইটুকুই গ্রাহ্য যে, ছেলে কানা, খোঁড়া বা কুব্জ না হয়! বলা বাহুল্য যে, ছেলেটির শত্রুপক্ষও ইহার সম্বন্ধে এই ধরণের কোনও অপবাদ দিতে পারে নাই। তবে আমরা শুনিয়াছি, বিবাহের রাত্রে ছাঁদনাতলায় পাত্র প্রমথকে দেখিয়া মেয়েমহল চাপাসুরে বলিয়াছিল—বরের নামটি কিন্তু বাপ-মা বেছে বেছে ঠিক রেখেছে, হুবহু সত্যি! বাসর ঘরেও কিশোরীর দল ক'নে উষাকে বরের পাশে বসাইয়া হাসিমুখে সুর করিয়া বলিয়াছিল, 'উষার আলোয় প'ড়লো ধরা—চেলী-পরা চামচিকে!'

কিন্তু ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় নাই। উষাও যে তাহার এই কুরূপ বরটির সম্বন্ধে কোনরূপ বিরাগ প্রকাশ করিয়াছে, এমন কথাও কেহ শুনে নাই। বিবাহ-বাসরেই সম্প্রদানের সময় বরের সম্বন্ধে সমবেত পল্লী-মাতব্বরদের প্রশস্তি এই রূপসী মেয়েটির কোমল চিত্তটি ভরাইয়া দিয়াছিল,—হ্যাঁ, কুলে-শীলে ছেলের মত ছেলে বটে! কোন দিকে এতটুকু খুঁত নেই, গাঙ্গুলীর ভাগ্য ভালো ; আর, মেয়েটাও সার্থক তপস্যা ক'রেছিল!

বিবাহের পর বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপে সমাজপতিদের এক বৈঠক বসিয়াছিল। তখনও নিবারণ গাঙ্গুলী এই দলের অন্যতম চাঁই। গোঁসাই বাঁড়ুয্যে কথায় কথায় কহিলেন,—চুটিয়ে কাজ ক'রেছ গাঙ্গুলী, খুঁত কিছুতেই হ'তে দাওনি ; তাহ'লে তিন হাজারেই কুলিয়ে গেল ত?

নিবারণ গাঙ্গুলী মুখখানা গম্ভীর করিয়া উত্তর দিলেন,—পাগল! তিন হাজার ত দিতে থুতেই গেছে ; তারপর খাই খরচ, কুটুম্ব-সাক্ষাৎ আনা-নেওয়া, ফুল-শয্যা, বৌ-ভাত—এসব ধ'রলেও দু' হাজারের ধাক্কা। এটা এখন দেনায় দাঁড়িয়েছে।

তিনকড়ি বাঁড়ুজ্যে কহিলেন,—আমরাও তাই বলাবলি ক'রছিলুম, পাঁচের কমে গাঙ্গুলী কিছুতেই পার পাবে না।

মাধব মুখুজ্জ্যে মুখ টিপিয়া হাসিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—তা, তোমার ভাবনা কি হে;—নিজের পেনসিয়ান থেকে তিন হাজার বাগিয়েছ, এখন ছেলের মাইনে থেকেই ওটা তুলে নিতে পার! তোমার কাছে এ দেনা আর এমন কি, সম্বৎসরের ভেতরেই শোধ ক'রে ফেলবে।

নিবারণ গাঙ্গুলী কথাটার উত্তর একটু দেমাকের সুরেই দিলেন,—সম্বৎসর কেন, মনে ক'রলে সাত দিনের ভেতরেই সব চুকিয়ে ফেলে, ঝাড়া-হাত-পা হ'তে পারি। কিন্তু কি দরকার! দেনা কার নেই, শুনি? তা ছাড়া, যার ঘরে মাসটি কাবার হ'লেই সরকারের দফ্‌তর থেকে বাঁধা টাকা আসে, ছেলেও রাইটার্সবিল্ডিংএ কলম পেশে,—তাদের কাছে মালই বল, আর নগদা টাকাই বল—গছাবার জন্যে বড় বড় মহাজনরা চুলবুল ক'রে বেড়ায়!

গাঙ্গুলীর কথাগুলি সকলের ভাল লাগে নাই। তাঁহার অসাক্ষাতে অন্যান্য দলপতিরা এক যোট হইয়া বলিয়াছিলেন,—শুনলে কথা, এতটা ছ্যামাক কিন্তু ভাল নয়।

বোধ হয় গাঙ্গুলীর অদৃষ্ট ঠাকুরটিও সে সময় মনে মনে হাসিয়াছিলেন! সম্বৎসরও সবুর সহিল না, আট মাসের মধ্যেই হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঝঞ্ঝায় নিবারণ গাঙ্গুলীর আশার তরুটি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কুলীনপাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা একদা সবিস্ময়ে শুনিল—আফিস হইতে ফিরিবার সময় বাস-দুর্ঘটনায় নিবারণ গাঙ্গুলীর কৃতী পুত্রটি মারা পড়িয়াছে।

বাড়ী হইতে সকালে যে-ছেলে দিব্য সুস্থদেহে আফিসে বাহির হইয়াছিল, গভীর রাত্রিতে তাহারই প্রাণহীন দেহ বাড়ীর সম্মুখে নীত হইয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে, মানুষের জীবনের কোন স্থিরতা নাই, তাহা কিরূপ ক্ষণভঙ্গুর!

অতঃপর শোকমথিত দেহকে দৃঢ় করিয়া নিবারণ গাঙ্গুলী গৃহস্বামীর

কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহারই কয়েকদিন পূর্ব্বে সর্ব্বসমক্ষে সাত দিনের মধ্যে যে-ঋণ পরিশোধ করিবার সামর্থ্য রাখেন বলিয়াছিলেন, সাতটি বৎসরের মধ্যেও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এই ঋণই নানা সূত্রে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে—তাঁহার বৃত্তির অভাব এবং দুর্গতির ভবিষ্যৎ; ইহাতে প্রতিবেশী দলপতি সহযোগিদের কসরতও অল্প ছিল না।

কিন্তু এত ব্যয় করিয়া কন্যা উষাকে প্রমথর হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি কি সুখী হইতে পারিয়াছেন? তাঁহার এই দুর্দ্দিনে পরমাত্মীয় স্থানীয় প্রীতিভাজন কুটুম্বদের নিকট হইতে আন্তরিক সমবেদনা কিছু পাইয়াছেন? হায় রে—বাঙ্গালীর সমাজ! শীতের প্রারম্ভেই নিবারণ গাঙ্গুলীর সুখের সংসারে ভাঙ্গন ধরে; লোকে অতি বড় শত্রুর সম্বন্ধেও যে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা কল্পনা করিতে কুণ্ঠিত হয়, দুঃস্বপ্নের মতই তাহা দেখা দিয়া তাঁহার সংসার তছনছ করিয়া দেয়! কিন্তু সেই দুর্দ্দিনেও পোষোড়ার তত্ত্ব পাত্রপক্ষের কুলমর্য্যাদার অনুরূপ হয় নাই বলিয়া বৈবাহিকের নিষ্ঠুর পত্র নিবারণ গাঙ্গুলীর পৃষ্ঠে চাবুকের মতই তীক্ষ্ণ আঘাত দিয়াছিল!—'ছেলেই না হয় মরেছে; আর, মরেও অনেকের; কিন্তু এ রকম ঢাকী-ঢুলি বিদেয়ের শাল পাঠিয়ে কোনো বেহায়া কুলীনের ঘরে তত্ত্ব করে না!'

বৈবাহিকের উক্ত মন্তব্যের উপর বৈবাহিকা প্রেরিত শালখানা দুই হাতে ভাঙ্গিয়া দুমড়াইয়া বধূর মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—এ শাল তোমার পেঁড়ায় তুলে রাখ বৌমা, বাপের বাড়ী যখন যাবে—নিয়ে যেয়ো সঙ্গে ক'রে। বেইকে ব'ল, বেয়ান যখন ঘাটে যাবে, এই শাল দিয়ে যেন তাকে মুড়ে পাঠায়; ব'ল মিনসকে,—এ হ'চ্ছে ঘাটের শাল, পোষোড়ার তত্ত্বের নয়।

নিবারণ গাঙ্গুলীর অপরাধ, এই নিদারুণ অবস্থায় তিনি আসল

কাশ্মিরী-শাল দিয়া পোষোড়ার তত্ত্ব পাঠান নাই, তত্ত্বে যে শালখানি পাঠাইয়াছিলেন, কাশ্মিরী না হইলেও, তাহারও মর্য্যাদা ছিল।

এই একটি ঘটনা হইতেই নিবারণ গাঙ্গুলীর এদিককার সৌভাগ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণীর এইরূপ মনোবৃত্তি, সেখানে কুলবধূব মর্য্যাদা লইয়া প্রবেশ করিযা উষা কতদূর সুখী হইতে পারিয়াছিল, তাহাও অনুমান করা কঠিন নহে। আব ইঁহাদের মার্জ্জিত রুচি-পুত্র শ্রীমান্ প্রমথ তাহার এই রূপবতী সরলা সহধর্ম্মিণীটিকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল? সে কি এই ভ্রাতৃবিয়োগবিধুরা অকারণ লাঞ্ছিতা বালিকা-বধূব মর্ম্মবেদনা স্বামীব স্বাভাবিক আদর ও সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়া মোচন করিতে পারিয়াছিল?

প্রমথ তাহার বিবাহের ব্যাপারটা আগাগোড়া হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল, আর-সব দিক দিয়া তাহার হার হয় নাই বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে শ্বশুর তাহাকে খুব ঠকাইয়াছে। রাইটার্সবিল্ডিংসে যে লোক কলম পিষিযা মাথার চুল পাকাইয়াছে, তাহার মেয়ে কিনা ভালো করিয়া কলম ধরিতেই শিখে নাই, উষার হস্তাক্ষব দেখিয়া এবং বানান কবিয়া পড়া শুনিয়া প্রমথ শ্লেষের সুবে প্রশ্ন করিয়াছিল,—এত বিদ্যে পেযেছিলে কোথায?

বিদ্রূপ বুঝিবার মত বুদ্ধি উষাব অবশ্যই ছিল। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিল,—রাস্তায। প্রমথ মনে মনে বুঝিয়াছিল, তাহার বধূটি লেখাপড়া ভালো না জানিলেও কথা কহিবার কায়দা ভালো রকমই শিখিয়াছে, সুতবাং দুধেব সাধটুকু সে ঘোল দিযাই মিটাইবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও গোল বাধাইয়া দিল তাহার আফিসের সহকর্ম্মীরা। তাহারা বিদূষী বধূদের প্রশস্তি গাহিয়া প্রমথর কান দুটি ঝালা-পালা করিয়া তুলিত। একাউন্ট আফিসে প্রমথদের কাজ, রেলের

যেমন বিরাম নাই, তাহার হিসাবেরও সেই অবস্থা, শেষ আর হইতে চাহে না। এজন্য অনেকেই হিসাবের ফাইল বাড়ীতে লইয়া যাইত এবং টাকা আনা পাইয়ের ঠিকগুলি কষিয়া ও মিলাইয়া আফিসে আনিত। আফিসের সিনিয়ার কেরাণীরা জুনিয়ারদের ঘাড়ে এই খাটুনিটুকু বোঝার উপর শাকের আঁটির মতই চাপাইয়া দিতেন। প্রমথকে এজন্য আফিসের পাল্টা বাড়ী আসিয়া প্রত্যহ প্রায় দুইটি ঘণ্টা বেগার খাটিতে হইত এবং খুব বেজার হইয়াই যে এ কার্য্য সে করিত, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রমথ অবাক হইয়া দেখিত, অন্যান্য সেক্সনের তাহারই সমপদস্থ জুনিয়ারগণ ইহাতে রীতিমত অভ্যস্ত, তাহাদের কাহারও মুখে বিরক্তির চিহ্নও দেখা যায় না।

কৌতূহলী হইয়া একদা প্রমথ প্রশ্ন করিল,—হ্যাঁ হে, এই বেগার ঠেলতে তোমাদের বেজার ধরে না?

পরিতোষ রায় কহিল,—স'য়ে গেছে।

বিপিন চক্রবর্ত্তী জানাইল,—আমার ছোট ভাই কলেজে পড়ে, আঁকে তার খুব মাথা, ঠিকগুলো সেই দিয়ে দেয়।

কিন্তু বিধু সেন, শচীন ঘোষ ও বিমল গাঙ্গুলী মুখগুলি উঁচু করিয়া প্রায় একই সুরে যাহা ব্যক্ত করিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, তাহারা সবাই সুখের পায়রা, বাড়ী গিয়া ক্লাবে আড্ডা দেয় এবং ফাইলের কাজ বৌ ঠিকঠাক ক'রে রাখে।

প্রমথ অবাক! ইহাদের বৌ ফাইলের কাজ সারিয়া দেয়? বড় বড় টাকার অঙ্ক ঠিক দিতে সে নিজেই হিমসিম খাইয়া যায়, আর ইহাদের বৌ সে-সব হিসাব—

কল্পনার পথেও প্রমথ আর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহা কি সম্ভব?

কিন্তু ইহা যে সম্ভব এবং হুবহু সত্য, উক্ত তিনটি সহকর্ম্মীই স্ব স্ব

বধূর বিদ্যা ও বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহাদের কথায় ও নানারূপ লেখায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দিল। প্রমথর মুখখানার উপর তৎক্ষণাৎ নিজের বধূর অজ্ঞতার অভিজ্ঞান বুঝি কালির গোটা কতক আঁচড় টানিয়া ফেলিল!

বিদ্যা লইয়া বধূর সহিত পুনরায় প্রমথর বিবাদ বাধিল, এবার প্রমথর সুর অন্যপ্রকার। ইতরের মত তর্জ্জন করিয়া বধূর উদ্দেশ্যে কহিল,—কোথা থেকে একটা গো-মুখ্যু ধ'রে এনে আমার জীবনটাই মাটী ক'রে দিয়েছে। কে জানত, লেখাপড়া কিচ্ছু শেখে নি!

উষা স্থির করিতে পারিল না, স্বামীর মনে সহসা এ আফশোষ আবার কেন? ইহার পর্ব্ব ত অনেক পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে! উদ্দেশ্যটুকু উপলব্ধি করিতে সে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরেই কহিল,—লেখাপড়া শিখলে কি হ'ত?

উদ্ধতভাবেই প্রমথ কহিল,—হ'ত আমার শ্রাদ্ধ! চোখে কি চাপা দিয়ে থাক, দেখতে পাওনা—আফিসের কাজ এনে বাড়ীতেও খেটে মরি। আর সব মেয়েদের মত লেখাপড়া যদি শিখতে, এ কাজগুলোও ত ক'রে দিতে পারতে!

উষাও অমনই খপ করিয়া কহিল,—আর তুমি কি আমার হ'য়ে হাঁড়ি ঠেলতে?

আর যায় কোথা? প্রমথর অন্তরের পশুটা এবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই শ্রেণীর স্বামীরা রুষ্ট হইলে রাগের খোঁচায় শুধু স্ত্রী-বেচারীকে বিদ্ধ করিয়াই রেহাই দেয়না, তাহার পিতা-মাতাকে পর্য্যন্ত রীতিমত খোঁচা দিয়া তবে তৃপ্তি পায়। এখানেও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর সকলে প্রমথর ঘরে ছুটিয়া আসিল। প্রমথ তখন মারমুখী। তাহার কটূক্তি সকলেই শুনিল,—ইতর ছোটলোকের মেয়ে, তাই শিক্ষা-দীক্ষা সেই রকম!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হ'য়েছে শুনি ?

ছেলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিল। মা অমনই মুখখানা কঠিন করিয়া এবং নিজের কপালে হাতের চেটোটির প্রচণ্ড আঘাত দিয়া কহিলেন,—পোড়াকপাল আমার! বলে, সংসারের কাজই বড় সব ক'রছে বৌমা, যে আবার তোর হাতের দোসর হ'য়ে আপিসের কাজ ক'রে দেবে ? সে সব মেয়ে আলাদা ; তারা চুলও বাঁধে, আবার সবদিকে নজর রেখেও চলে! তোর শ্বশুর মিন্‌সে মেয়েকে যে মুখ্যু ক'রে রেখেছিল, সে কথা কি তখন জেনেছিলুম ছাই !

এই ঘটনার পর উষা তাহাব বাবাকে মনের আবেগে আঁকা-বাঁকা বড় বড় অক্ষরে যে চিঠিখানা লিখিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

"আমাকে লেখাপড়া না শিখাইয়া কি ঝকমারিই তোমরা করিয়াছ বাবা! এখন আমার মাথার দিব্যি দিতেছি, আশাকে তোমরা পণ্ডিত করিও।"

সরকারী দফ্‌তরের হিসাবী মানুষটি অতঃপর বুঝি কন্যার মনের হিসাব-টুকু বুঝিয়াই তাহার মিনতি রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কোনো বিধিনিষেধ সেখানে বাধা দিতে পারে নাই।

সাত বৎসর পরে কন্যার মিনতি এমন ভাবেই তিনি রক্ষা করিয়াছেন, যাহাতে এই পরগণার সর্ব্বত্রই একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

তিন

কিন্তু সাত বৎসর আগে যাঁহারা বাধা দিয়াছিলেন, সাত বৎসর পরে তাঁহারাই দল বাঁধিয়া নিবারণ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে আসিয়া আর একটা নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিলেন।

গোঁসাই বাঁড়ুয্যে কহিলেন,—মেয়েকেও ত এণ্ট্রেন্সো পাস করালে গাঙ্গুলী, কিন্তু পার ক'রবার কি ব্যবস্থা ক'রছ শুনি ?

তিনকড়ি বাঁড়ুয্যে জানাইলেন,—তুমি যদিও আমাদের দলছাড়া হ'য়েছ, কিন্তু আমরা তোমাকে ছাড়তে পারিনি ; রাতদিনই তোমার কথা ভাবি, তাই না-এসে পারিনি।

বাঁড়ুয্যের কথা শেষ হইতেই মাধব মুখুয্যে তৎক্ষণাৎ পোঁ ধরিলেন,—একদিন ত তুমিও দলের চাঁই ছিলে হে, গেরামের আর সবাই ভুললেও, আমরা ত সে কথা ভুলতে পারিনে !

ত্রিমূর্ত্তিকে দেখিয়াই নিবারণ গাঙ্গুলী শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। পর পর তিনটি প্রাণীর ত্রিবিধ উক্তি তিনি শিষ্টাচারের অনুরোধেই ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিলেন এবং অতি সংক্ষেপেই কহিলেন,—কথা কিছু আছে ?

বাঁড়ুয্যে মুখের ভঙ্গী অদ্ভুত রকম করিয়া সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—শোন কথা ! একেই বলে—যার বে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই !

নিবারণ গাঙ্গুলী কহিলেন,—ভনিতা থাকনা, আসল বক্তব্যটাই শুনি ?

ত্রিমূর্ত্তির চোখে চোখে বিজলীর গতিতে একটা সঙ্কেত হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই বাঁড়ুয্যে মুখখানা একটু শক্ত করিয়া কহিলেন,—তুমি যখন কাজের লোক, বাজে কথা ছেড়ে আসল কথাটাই তাহ'লে বলি,—মেয়ে ত

পাস ক'রেছে, ফাষ্টোও নাকি হ'য়েছে শুনছি ; কিন্তু পারের ব্যবস্থাটা কি ক'রছ ?

নিবাবণ গাঙ্গুলী বলিলেন,—ও,—এই কথা ? 'বিশেষ' কিছু ভাবি নি।

মুখুয্যে প্রশ্ন করিলেন,—'অবিশেষ' কি ভেবেছ শুনি ?

গাঙ্গুলী কহিলেন,—শুনবে ? মেয়ে পাস ক'রেছে, ওর জানাশোনা জনকতককে খাওয়াবার আজ ব্যবস্থা করা হ'য়েছে ; সেটা যাতে ভালভাবে হ'য়ে যায়, সেইটিই এখন ভাবছি।

বাঁড়ুয্যে কহিলেন,—বটে ! তাহ'লে আমাদের কথাটা ভেসেই গেল, —পারের ভাবনা নেই বল ?

গাঙ্গুলী হাসিয়া উত্তর দিলেন,—ও ভাবনাটা নিজেদের সম্বন্ধেই ভাবা ভালো, তাহ'লে তোমাদের আখেরের একটা গতি হয়, আর পরের মেয়ে-গুলোও বেঁচে যায়।

ত্রিমূর্ত্তি একসঙ্গে ত্রিভঙ্গ হইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন,—কি রকম !

নিবারণ গাঙ্গুলী কহিলেন,—বুঝতেই যখন পেরেছ, কথা আর বাড়িয়ে লাভ কি ? হ্যাঁ, তবে আমার কথা এই যে, মেয়ের সম্বন্ধে এখনো আমি বে-পরোয়া, কোনো ভাবনাই নেই।

—কিন্তু সমাজের আছে।

—যার মাথা নেই, তার আবার মাথা ব্যথা !

—এ কথার মানে ?

—মানে এই যে, সমাজ মৃত।

দুই চক্ষু পাকাইয়া বাঁড়ুয্যে কহিলেন,—কি ব'ললে, সমাজ মৃত ?

নিবারণ গাঙ্গুলী দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—তোমরাই ত তাকে গলা টিপে মেরেছ ; সমাজ মরেছে ব'লেই তাকে উপেক্ষা ক'রে রাজার আইন আজ বিধান গড়ছে।

বাঁড়ুয্যে একথায় কান না দিয়া আগের কথাটা ধরিয়াই তর্জ্জন তুলিলেন,—সমাজ যে মরেনি, তোমার এই পাস করা মেয়েকে পার ক'রবার ব্যাপারে আমরা সেটা ভালো ক'রেই দেখিয়ে দেব।

বাঁড়ুয্যেও অনুরূপ সুরে শাসাইয়া কহিলেন,—তখন মেয়েকে ইংরিজী স্কুলে পাঠাতে মানা ক'রেছিলুম, শোনা হয়নি; এবার সামলাতে হবে তার ঠেলা—বুঝেছ?

মুখুয্যে বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া বুঝিবার বিষয়টির ঈষৎ আভাষ দিয়া কহিলেন,—ভেবেছ, আমাদের ছাপিয়ে সস্তায় ক'রবে কিস্তিমাত। কিন্তু সে ঝুনো মুহুরী, উকীল চরিয়ে খায়, সে গুড়েও বালি!

মুখুয্যের কথাটা বুঝি নিবারণ গাঙ্গুলীকে সহসা বিচলিত করিল; তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই বাঁড়ুয্যে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে হাত-মুখ-নাড়িয়া কহিলেন,—তা ত জাননা,—তুমি বেড়াও গাছের গোড়ায়, আর আমরা চরি পাতায় পাতায়; টের পাবে এর মজা—

ত্রিমূর্ত্তিই এক সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন। নিবারণ গাঙ্গুলী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ঠায় তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চার

বাহিরের ঘরের বিতর্ক বাড়ীর ভিতরে মহিলাদিগকেও উৎকর্ণ ও ও বিচলিত করিয়াছিল। নিবারণ গাঙ্গুলীর জ্যেষ্ঠা কন্যা উষাও এ সময় পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। গৃহিণী বিমলা দেবী দুই কন্যাকে লইয়া রন্ধন-শালায় ভোজের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। আরও অনেকেই সেখানে ছিলেন। সকলেই হাতের কাজ ফেলিয়া বাহিরের ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিলেন।

ত্রিমূর্ত্তি তখন অদৃশ্য, কিন্তু তাঁহাদের শাসানী বুঝি বায়ুর তরঙ্গে শ্বসিয়া একটা বিভীষিকা তুলিয়াছে। নিবারণ গাঙ্গুলীর দৃপ্ত মুখখানাও যেন মলিন ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাড়ী ব'য়ে ওঁরা কেলেঙ্কারী ক'রতে এসেছিলেন কেন?

কর্ত্তা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—স্বভাব। আশার জন্য গায়ে জ্বালা ধ'রে গেছে। এখন এই নিয়ে একটা ঘোঁট পাকাবে।

গৃহিণী মুখখানা কঠিন করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—ঘোঁট পাকিয়ে ক'রবে কি?

কর্ত্তা কহিলেন,—চেষ্টা ক'রবে সম্বন্ধটা যাতে ভেঙ্গে যায়, বেয়ে বেয়ে দেখবে সবদিক দিয়ে, যাতে আশার আইবুড়ো নামটা খণ্ডাতে না পারে।

গৃহিণীর বুকের ভিতরটা অমনি ছাঁৎ করিয়া উঠিল। শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন,—বল কি?

কর্ত্তা কহিলেন,—এই ব'লেই ত শাসিয়ে গেল। নন্দ মুহুরীর ছেলের সঙ্গে চুপি চুপি যে সম্বন্ধটা হ'য়ে আছে, তার খবরও ওরা জেনেছে বোঝা গেল।

নিজের নামটা উঠিতেই মুখখানা ভার করিয়া আশা চলিয়া গিয়াছিল। ঊষা অবাক হইয়া পিতার কথা শুনিতেছিল, সুযোগ পাইয়া এবার কহিল, —কিন্তু কি দোষটা আমরা ক'রেছি বাবা, এমন ক'রে শাসাবে?

কর্ত্তা হঠাৎ হাসিয়া কহিলেন,—তুমিই ত তার চারা বুনেছ মা? মনে নেই, আশাকে পণ্ডিত ক'রতে চেয়েছিলে? তোমার সে চিঠি এখনও তোলা আছে।

ঊষা কহিল,—চেয়েছিলুমই ত! সে-মুখ মা-সরস্বতী রেখেছেন,—পাড়ার অনেকেরই থোঁতা মুখ ভোঁতা হ'য়ে গেছে। আমরা কি হ্যাকা, বুঝিনি এ সব কাণ্ড কেন?

গৃহিণী ঈষৎ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—হ্যাঁ গা, তোমার কি মনে হয়—নন্দ মুহুরী ওদের উস্কানিতে কথার নড়চড় ক'রবে?

কর্ত্তা কহিলেন,—করবে না, তাইত জানি। কিন্তু এখন যেন কি রকম সন্দেহ হ'চ্ছে। যাই হোক, আমি একবার যাই, জেনে আসি; নইলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না ত!

নন্দ মুহুরী কুলীন পাড়ারই এক বর্দ্ধিষ্ণু বাসিন্দা। এক নামজাদা উকীলের মুহুরীগিরির পেশায় ইনি যাহা উপায় করেন, অনেক উকীলের পক্ষেও তাহা দুর্লভ। অবস্থা যে ভালো এবং লোকটি শাঁসালো, তাঁহার বশতবাড়ী ও প্রকাণ্ড ভুঁড়ি হইতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। খুব হিসাবী মানুষ; ওজন করিয়া কথা বলেন, জীবনে কখন ঠকেন নাই বা কাহারও কাছে কোনদিন হারেন নাই, বরাবর জিতিয়াই চলিয়াছেন। বিবাহের ব্যাপারে ইনিই প্রথমে এ অঞ্চল হইতে পদ্মার পারে সওদা করিতে যান; সে সময় অনেকেই হাসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাই এক্ষণে এই হিসিবী মানুষটির অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া হিংসায় অস্থির! কেননা, শ্বশুরের অবর্ত্তমানে তাঁহার তাবৎ সম্পত্তির ইনিই উত্তরাধিকারী এবং তাহার পরিমাপও নাকি বিশ হাজারের কাছাকাছি। পুত্র অজিত মাতামহের আগ্রহে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ঢাকা হইতেই সে ম্যাট্রিক ও আই. এ. পাস করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছে।

এই ছেলেটির সঙ্গেই নিবারণ গাঙ্গুলী আশার বিবাহের কথাটা পাড়িয়াছিলেন এবং গোপনে গোপনে সম্বন্ধটা এক রকম পাকা হইয়াই আছে।

নন্দ মুহুরী তখন নিজেই চুপি চুপি বলিয়াছিলেন,—আপনার মেয়েকে আমি ঘরে আনবই, তবে কথাটা এখন প্রকাশ ক'রবেন না। আপনার

মেয়েও মাট্রিক পাস করুক, আমার ছেলেও বি, এ.র গণ্ডীটা পেরিয়ে আসুক, তারপরই শুভসংযোগ হবে। আপনি শুধু কোনো রকমে ছুটি হাজারের সংস্থান করুন, এতেই সব হ'য়ে যাবে। আর, কথাটা এখন প্রকাশ ক'রতে বারণ করছি এই জন্য যে, অনেকেই হাঁটাহাঁটি ক'রছে, আদালতে পর্য্যন্ত ধর্ণা দিয়ে আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে, বলেন কেন!

তথাপি গাঙ্গুলী বলিয়াছিলেন,—তাহ'লে দেখা শোনাটা হ'য়ে থাকনা; কথা পাকা হ'য়ে গেছে জানলে আর কেউ হাঁটাহাঁটি ক'রবে না, আদালতে গিয়েও জ্বালাবে না।

নন্দ মুহুরী তখন মুরুব্বীর চালে মাথা নাড়িয়া এই বলিয়া নিবারণ গাঙ্গুলীকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন,—মুখের জবান যখন দিয়েছি, পাকা হ'তে আর বাকি কি রইল শুনি? নাই বা লোক জানাজানি হ'ল! আগে থাকতে কথাটা সবাইকে জানালে আপনারই ক্ষতি, ছাপোষা মানুষ আপনি, তখন থাই পাবেন না! পারবেন সবার খাঁই মেটাতে? চুপ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকুন গিয়ে ঘরে, পাসের খবর বেরুলেই ছেলেকে আনিয়ে—ঝোপ বুঝে কোপ, বুঝেছেন; মাথার ওপর ছেলের মাতামহ র'য়েছেন,—ছুদিক ত বজায় রাখতে হবে!

সুতরাং নিবারণ গাঙ্গুলী এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিলেন। বসত-বাড়ীখানাকে উপলক্ষ করিয়া সাবেক দেনার উপর আরও হাজার ছুই টাকার দেনার দড়ি গলায় বাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়াও রাখিয়াছিলেন। পাসের খবর পাইবামাত্র বিপুল আনন্দে নন্দ মুহুরীর বাড়ীতে গিয়া এই সুসংবাদটি যখন দাখিল করেন, নন্দ মুহুরী তাহার উত্তরে তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর মুখে হাসির একটু ঝিলিক তুলিয়া বলিয়াছিলেন—গুড্ নিউস্! (সুখবর) ছেলের তরফ থেকেও এই রকম নিউস এলে একবারে লাইন-ক্লীয়ার!

ইহার পরই ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাব ও এই গোপনীয় বিষয়টিকে লক্ষ্য করিয়া নির্ঘাত পরিহাস। কিন্তু নিবারণ গাঙ্গুলীর দুই কানে তাহা যেন নিয়তির অট্টহাসির মতই নির্ম্মম আঘাত দিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে বিচলিত হইবারই কথা।

পাঁচ

বাহিরের ঘরখানির ভিতর পশারওয়ালা উকীলেব মতই সেরাস্তা সাজাইয়া নন্দ মুহুরী বসিযাছিলেন, তাঁহার সম্মুখে ও আশে-পাশে বিভিন্ন বয়স, জাতি ও প্রকৃতির অনেকগুলি অনুন্নতশ্রেণীর মক্কেল এমন অসময়েও হাজির ছিল। মুহুরীবাবুই ইহাদের কাছে একবারে উকীল-হাকিম, হার-জিত সমস্তই, সুতরাং এদিন কাছারী বন্ধ থাকিলেও ইহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই; মুহুরীবাবুর পরিচিত ঘবেই অন্যান্য ছুটির দিনটির মত কাছারী বসাইয়াছিল। সহসা এই ঘরে ঢুকিলেই মনে হয়, যেন পাঠশালার ছুটীর পর সর্দ্দার-গোড়োদের লইয়া গুরুমহাশয় মুখখানা গম্ভীর করিয়া ছাত্র-শাসনের নূতন কিছু আইন-কানুন বাতলাইতেছেন।

নিবারণ গাঙ্গুলীকে দেখিযাই নন্দ মুহুরী তাঁহার গম্ভীর মুখখানি বিকৃত করিয়া ভৎ‍র্সনার সুরেই কহিলেন,—একবারে পুকুর গুলিয়ে ফেলেছেন!

নিবারণ গাঙ্গুলী বিস্ময়াহত হইয়া কহিলেন,—কি রকম?

—রকম? যা বারণ ক'রেছিলুম, তাই ক'রে বসেছেন। কথা আর কিছুই চাপা নেই, কাক-চীলও জেনেছে; শ্বশুরমশাই পর্য্যন্ত চিঠি লিখে খোঁচা দিয়েছেন—বিয়ের ব্যাপারে অজিতের দর নাকি তুমি দু-হাজার দিয়েছ, আর এখানে লোহাগড়ের বাঁড়ুয্যেরা দশ হাজার অবধি উঠে সাধাসাধি ক'রছে! কথাটা ফাঁস ক'র্লেন কেন?

—আপনি ভুল শুনেছেন, আমার তরফ থেকে কিছুতেই এ কথা বেরোয়নি ; আমিই বরং এইমাত্র জানতে পেরে ছুটে এসেছি আপ্‌নার কাছে।

—তাহ'লে কি আপনি ব'লতে চান, আমিই ঢাক পিটে বেড়াচ্ছি যে আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হবে—এই ব'লে ?

—আমি কেন তা ব'লব ? আর এই বলা-বলিতেই বা কি এমন এসে যাচ্ছে তা ত বুঝতে পারছি না।

—আপনি ত বুঝতে পারবেন না! অথচ, সুরু থেকেই আপনাকে বুঝিয়ে আসছি।

নিবারণ গাঙ্গুলী এদিক দিয়া আর কথা না বাড়াইয়া নন্দ মুহুরীর কথাই কতকটা মানিয়া লইয়া কহিলেন,—তা জানি, কিন্তু আপনি যে ভুল ক'রেছেন, বোঝানো যত সহজ বোঝা তত সহজ নয়। তবে আসলে আমি এইটুকু বুঝি যে, লোকে যাই বলুক, আপনি আমি ঠিক থাকলেই হ'ল।

নন্দ মুহুরী মুখখানা আরও গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—কথা ঠিক, কিন্তু মানুষের কান তা মানে না। জানেন, এই নিয়ে কত লোক কত কথা বাড়ী ব'য়ে এসে ব'লে যাচ্ছে! এখন দেখছি, মস্ত ফ্যাঁসাদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—আপনার মেয়ের ঐ পাসের ব্যাপারটা!

বিস্ময়ের আর একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খাইয়া নিবারণ গাঙ্গুলী ক্ষণকাল নন্দ মুহুরীর গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে একটা চাপা নিশ্বাসের সহিত মনের বিস্ময়টুকু যেন বাহির করিয়া দিয়া একটু অস্বাভাবিক সুরেই কহিলেন,—আপনার মুখেও একথা শুনব, সেটা কিন্তু প্রত্যাশা করিনি, নন্দবাবু!

নন্দবাবু কহিলেন,—আমি নিরুপায়। সব দিক ভেবেই আমাকে

এ কথা ব'লতে হ'যেছে। ধরুন, আমার ছেলেই না-হয় বি. এ. অবধি উঠেছে; তার দিক দিয়ে এটা শোভন হ'লেও, সংসারের আর সকলের দিক দিয়ে এটা ভারি বেখাপ্পা নয কি? বেশী খুলে নাই বা বললুম। অবশ্য আপনি বলতে পারেন, আগে কেন এটা ভাবেন নি! কিন্তু দেখুন, সব সময় সব কথাই আগে থাকতে ভেবে পাকা করা চলে না, পরে নড়চড় হ'য়ে থাকেই।

নিবারণ গাঙ্গুলীর বুকের ভিতর নন্দ মুহুরীর শেষের কথাগুলি বুঝি হাতুড়ির ঘা দিল। ব্যথাহতকণ্ঠে তিনি এবার প্রশ্ন করিলেন,—তাহ'লে আপনি যে কথা দিয়েছিলেন, এখন তা আর—

প্রশ্নের স্বর এইখানেই রুদ্ধ হইয়া গেল। নন্দ মুহুরী তাড়াতাড়ি কহিলেন,—আপনি যে আশঙ্কা ক'রছেন, ঠিক তাই নয়। যদিও ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আমি কোনরকম ক'রে সামলে নিয়েছি। তবে আপনাকে আর একটু উঠতে হবে।

নিবারণ গাঙ্গুলীর বিক্ষুব্ধ চিত্তটি আবার দুলিয়া উঠিল, তবে একেবারে চরম প্রত্যাখ্যান নহে—আশা এখনও আছে! এই আশ্বাসটুকুর প্রভাব প্রত্যেক কন্যাদায়গ্রস্তই উপলব্ধি করিয়া থাকেন, নিবারণ গাঙ্গুলীও করিলেন। কণ্ঠের আকস্মিক গাঢ়তায় যে স্বর রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই এবার আশার আবেশে বাহির হইল,—বাঁচালেন নন্দবাবু! বলুন, কি ক'রতে হবে?

নন্দবাবু সহজকণ্ঠেই গাঙ্গুলীর কর্ত্তব্যটি বলিয়া দিলেন,—একটি হাজার আপনাকে আরও যোগাড় ক'রতে হবে।

নিবারণ গাঙ্গুলী কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব কোমল ও করুণ করিয়া কহিলেন,—যোগাড়ের কথা আপনি ত সবই জানেন। বড় মেয়ের বিয়ের দরুণ দু-হাজার এখনও শোধ হয নি, সুদটা কায়ক্লেশে দিয়ে

এসেছি ব'লেই—মহাজন সেকেণ্ড মর্টগেজে আরও দু-হাজার দিতে রাজী হ'য়েছে। কিন্তু ও বাড়ীর ওপর—ওর বেশী একটি পয়সাও সে দেবে না। ঐ বাড়ীখানা ছাড়া আমার ত আর কিছু নেই নন্দবাবু!

নন্দবাবু অতঃপর এই বলিয়া কথাটা শেষ করিলেন,—আপনি ত রাজী হ'ন আগে, টাকার যোগাড় না হয় ক'রে দেওয়া যাবে। মহাজনের ভাবনা কি?

ছয়

নন্দ মুহুরীর এই নির্দ্দেশটিই অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর ভাবনাটুকু নিঃশেষ করিয়া দিল। পাকশালায় কর্ম্মে ব্যাপৃতা দুই ভগিনী উৎকর্ণ হইয়াই আজিকার অবাঞ্ছিত ব্যাপারটির এইরূপ নিষ্পত্তি তাহাদের মায়ের মন্তব্যেই শুনিল,—অল্পে-অল্পে হবার যো কি, কেমন বরাত! তবু এই রক্ষে যে, মিন্‌সে একবারে 'না' বলে নি। যাই হোক, মহাজন যখন ঠিক ক'রে দেবে বলেছে, এ ছাড়া আর উপায় কি, আর মত না দিয়েই বা ক'রবে কি বল! পার্ তো ক'রতে হবে মেয়েকে, পাস ক'রেছে ব'লে রেহাই ত কেউ দেবে না—বরং আরো চেপে ধরবে।

কমনীয় মুখখানা নিরতিশয় কঠিন করিয়া এবং হাতের কাজগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাড়িয়া আশা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। ময়দার ঠুলির ভিতর স্বহস্ত প্রস্তুত পুরটুকু দিয়া সে এতক্ষণ সুষ্ঠুভাবে কাশ্মিরী সিঙ্গাড়া প্রস্তুত করিতেছিল। ঊষা কতিপয় বালক বালিকাকে লইয়া চপের জন্য সিদ্ধ আলুগুলি ময়দার মত ঠাসিতেছিল। হাত দুইখানি তাহার কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও চক্ষু দুইটির দৃষ্টি স্নেহের বোনটির মুখের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আশার এইভাবে হঠাৎ উঠিয়া যাইবার ভঙ্গিটা

তাহার দৃষ্টিতে ভাল লাগিল না, শিশু-সহকর্ম্মীদের প্রতি যথাযথ নির্দ্দেশ দিয়া সেও তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রগতিতে ভগিনীর অনুসরণ করিল।

ময়দামাখা হাত দুখানি ধুইয়া আশা তাহার পড়িবার ছোট ঘরটির ভিতর ঢুকিতেই উষা পিছন হইতে কহিল,—হ'ল কি তোর, সব ফেলে-ঝুলে যে উঠে এলি! ও-সব ক'রবে কে শুনি?

মুখখানা শক্ত করিয়া আশা উত্তর দিল,—ও সবের আর দরকার নেই দিদি!

দিদি স্তব্ধ হইয়া বোনটির মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, তাহার পর কণ্ঠের স্বর কিঞ্চিৎ রুক্ষ করিয়া কহিল,—এ কথার মানে? আর খানিক পরেই তো নেমন্তন্নেরা এসে হাজির হবে, তোর হাতের সিঙ্গাড়া খাবার জন্যই তাদের অত ঝোঁক, আর তুই কিনা—

দিদির কথায় এইস্থানে খপ করিয়া বাধা দিয়া আশা কহিল,—সে পাট এখুনি চুকিয়ে দিতেই ছুটে এসেছি।

বিস্ময়ের সুরে উষা প্রশ্ন করিল,—কি তুই ভেবেছিস শুনি?

এবার সহজ কণ্ঠেই আশা উত্তর দিল,—যাদের আসবার কথা, চিঠি লিখে আসতে মানা ক'রে দেব, দিদি।

কি লিখবি চিঠিতে?

লিখবো—হঠাৎ একটা প্রতিবন্ধক পড়েছে।

উষা তাহার স্বাস্থ্যপুষ্ট পুরন্ত মুখখানি গম্ভীর করিয়া ঈষৎ অনুযোগের সুরেই কহিল,—হঠাৎ এ পাগলামি তোর মাথায় ঢুকলো কেন?

কেন?—একটা আর্ত্তস্বর এই সপ্তদশী তরুণীর নির্ম্মল অন্তরটি মথিত ও তাহার আধার-স্থল অনুপম সুগৌর দেহটি বিবর্ণ করিয়া যেন তাহার মুখ দিয়া সোচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া আসিল,—কেন? এখনো এই পোড়া

পাসের ব্যাপার নিয়ে তুমি স্ফূর্ত্তির আশা রাখো দিদি,—লোক নেমন্তন্ন ক'রে ভোজ দিতে চাও ?

ভগিনীর মর্ম্মবেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াও উষা তাহা জোর করিয়া চাপিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল,—কেন, কি হ'য়েছে,—কার আটচালায় আমরা মাথা গুঁজে র'য়েছি যে তাদের ভয়ে সাধ-আহ্লাদ বন্ধ ক'রতে হবে ? যে জন্য আমরা ঘটা ক'রছি, কার বাড়ীতে সেটা ঘটেছে শুনি ?

দিদির এই প্রচ্ছন্ন প্রশস্তিও বুঝি আজ আশাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিল ; সর্ব্বাঙ্গে একটা জ্বালা অনুভব করিয়াই সে আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—এখনো এই নিয়ে তুমি গর্ব্ব ক'রছ দিদি ! সমস্ত শুনেও কানে তোমার তালা ধরে নি ? সেনেট হাউস থেকে একটিবার ঘুরে এলেই ছেলেদের দর চড়ে, পাস ক'রলে ত কথাই নেই : আর আমার জন্য বাবাকে আরো হাজার টাকার দায়ী হ'তে হচ্ছে—যেহেতু আমি মেয়ে। তবু তুমি এই নিয়ে সাধ-আহ্লাদ ক'রতে চাইছ !

উষার মনের সকল শক্তি বুঝি ভগিনীর এই মর্ম্মভেদী কয়টি কথায় এক নিমেষে কোথায় ভাসিয়া গেল। একটা বুক ভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলিয়া সে গাঢ়স্বর কহিল,—তোর ব্যথা কি আমি সত্যিই বুঝিনি রে, কিন্তু কি ক'রবি বল, কি ক'রতে পারি আমরা, কুলীনের মেয়েকে অনেক সইতে হয়।

আশা সোজা হইয়া দিদির মুখের দিকে দুইটি আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া চাহিল, কিন্তু সে মুখের ব্যথাতুর ভঙ্গীটুকু তৎক্ষণাৎ যেন তাহার মনের কঠিন জবাবটির প্রকাশে বাধা দিল। এক নিমেষে মন ও মুখের ভাবটুকু কোমল করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে আশা কহিল,—কেন আমাকে লেখা-পড়া শিখিয়েছিলে দিদি, কেন মূর্খ ক'রে রাখনি ?

উষা বোনটির আরও কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার মুখখানি

তুলিয়া ধরিয়া আরও করুণ সুরে কহিল,—তোর পাস করাটাই যদি দোষের হ’য়ে থাকে, সে দোষের ভাগী যে আমিই বোন, আমিই তোকে—

অশ্রুর আবর্ত্তে ঊষার কণ্ঠ এইখানে রুদ্ধ হইল, তাড়াতাড়ি অঞ্চলটি টানিয়া সে চক্ষুর উপর তুলিল।

আশা কহিল,—আমি সব জানি দিদি, তোমার সে চিঠি বাবা আমাকে দেখিয়েছিলেন; আর এখন তোমাকে ব’লছি দিদি, তোমার চিঠিই আমাকে শিক্ষার পথে এমন ক’রে এগিযে দিয়েছে, আমি যে মনে মনে পণ ক’রেই পড়াশুনা ক’রেছি—তোমার চিঠির মুখ রাখবই। কিন্তু আজ সব জেনে শুনে বড় দুঃখেই ব’লছি দিদি—যদি তুমি ও চিঠি না লিখতে!

ঊষা কহিল,—কেন যে, সে চিঠি লিখিছিলুম, সে কথাও ত শুনেছিস্; তার পর বছর বছর তুই পাস ক’বে যতবার ওপরে উঠেছিস্, তার জন্যে আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি, ঠাকুর দেবতার কাছে কত মানত ক’রেছি, তার কি ব’লব! পাসের খবর তোর বেরুতে, বোধ হয় আমাব মতন এত খুসী আর কেউ হয় নি।

আশা কহিল,—কিন্তু তার পরিণাম কি হ’ল দিদি! আজ সত্যিই এটা সার্থক হ’ত, আমি মেয়ে না হ’য়ে যদি বাবার ছেলে হতুম!

আশার এই মর্ম্মভেদী উক্তি ঊষার বুকটির ভিতর যেন তীক্ষ্ণ কাঁটার মতই বিঁধিল। সুন্দর মুখখানি ঈষৎ বিকৃত করিয়াই সে কহিল,—কিন্তু এ কথা ত তোর মুখে এখন সাজে না আশা।

দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া আশা কহিল,—কেন?

ঊষা কহিল,—মেয়েদের পাস করা কি তাহ’লে শুধু শুধু লোক হাসাতে আর পোড়া সমাজের ভুলের বোঝা আরও ভারী ক’রবার জন্যই রে?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে আশা ডাকিল,—দিদি!

সে আহ্বানে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অধিকতর উত্তেজিতকণ্ঠে দিদি কহিল,—শুনেছি, লেখা পড়া শিখলে নাকি অনেক ভুল ভেঙ্গে যায়। এ কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তোরাই ত সমাজের ভুল ভেঙ্গে দিতে পারিস্; সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে স্পষ্ট যদি দেখিয়ে দিস যে, মেয়ে হ'লেও তোরা কিছুতেই ছেলের চেয়ে কম ন'স, তাহ'লে কার সাধ্যি মেয়েদের ছোট করে?

উচ্ছ্বসিত উল্লাসে দুই চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া আশা কহিল,—তবে কেন তুমি বাধা দিচ্ছিলে, যখন আমার ব্যথা সবই বুঝেছ?

ঊষা কহিল,—কিন্তু ওতে ত ভুল কারুর ভাঙ্গবে না বোন, বরং কতকগুলো মনই ভেঙ্গে যাবে। তৈরী রান্নাবান্না নষ্ট হবে; যাদের নেমন্তন্ন করা হ'য়েছে, তাঁরাও কত কি ভাববেন; বাবা মা রাগ ক'রবেন, আর তুমিও কি তাতে স্বোয়াস্তি পাবে—কষ্ট হবে না মনে? তোমার শিক্ষা কি এতে সায় দেয়? এ ছাড়া কি নিষ্কৃতির অন্য রাস্তা নেই?

আশা দুই হাতে দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল,—শিক্ষার রাস্তা তুমিই দেখিয়েছ, নিষ্কৃতির রাস্তাও তুমিই দেখিয়ে দিলে; পায়ের ধূলো দাও দিদি।

গৃহিণীর পরামর্শ অনুসারে গৃহস্বামী নন্দমুহুরীকে সঙ্গে সঙ্গেই জানাইতে গিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রস্তাবেই তিনি সম্মত, অবশ্য মহাজনের ভার মুহুরী মহাশয়কেই লইতে হইবে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তিনি আর একটি সুখবর লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। খবরটি এই যে, নন্দমুহুরীর ছেলে অজিত তাহার কতিপয় বন্ধুর সহিত ঢাকা হইতে রওনা হইয়াছে। পরদিন অপরাহ্ণে তাহারা আশাকে দেখিতে আসিবে।

দুই ভগিনী পুনরায় পাকশালার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। সংবাদটি শুনিবামাত্রই তাহাদের চোখে চোখে যে ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল, কেহ তাহা লক্ষ্য করিল কি ?

সাত

এক মাস পরের কথা।

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে সায়াহ্নের ট্রেণে নিবারণ গাঙ্গুলী কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সারাদিনের শ্রমশ্রান্ত ও আশাভঙ্গে অবসন্ন দেহটাকে কোনও প্রকারে টানিয়া টলিতে টলিতে যখন তিনি ট্রেণের একখানা দীর্ঘ কামরা একেবারে খালি দেখিয়া তাহারই একটি কোণে আশ্রয় লইয়াছিলেন, ট্রেণ ছাড়িতে তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। কিন্তু এই বিলম্বটুকুই আজ অতি-বাঞ্ছিত হইয়াই বুঝি নিবারণ গাঙ্গুলীকে সান্ত্বনা দিতেছিল। ট্রেণখানা আজ গতিশক্তি হারাইয়া এই প্লাট্‌ফরমে সারারাত্রি পড়িয়া থাকিলেও, তাঁহার পক্ষ হইতে কোনও আপত্তি বা অভিযোগ উঠিবার সম্ভাবনাও ছিল না।

অথচ, অন্যদিন কোনও অনিবার্য্য কারণে এই ট্রেণ ছাড়িতে নির্দ্দিষ্ট সময়টুকু অতিক্রম করিলে, এই মানুষটিকেই কিরূপ চঞ্চল ও বিরক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। অতীতের কত কথাই আজ তাঁহার মানস-পটে বায়স্কোপের ছবির মতই একটী একটী করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল।

দশ বৎসর পূর্ব্বেও এই ট্রেণে তিনি বাড়ী ফিরিতেন ; আর পাশে বা সম্মুখে সাথীর মত বসিয়া থাকিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরঞ্জন। এই আফিস হইতে উভয়ে এক সঙ্গে বাহির হইতেন, ট্রেণের একই কামরায় পাশাপাশি বা সামনাসামনি উভয়ে বসিতেন ; পাশের কামরাতেও

তাহাকে পাঠাইতে তাঁহার সদাসশঙ্ক চিত্ত সায় দিত না। তাহার পর যখন তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে হইল, সতর্কতার কত বিধিনিষেধ—কতরূপ নির্দ্দেশই তাহাকে প্রত্যহ দিতেন! সেই ট্রেণ, সেই ষ্টেশন, সেই সবই রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সেই নিরঞ্জন আজ কোথায়?

সমস্ত দেহটা মথিত করিয়া একটা নিশ্বাস সবেগে বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই ভাঙ্গা বুকখানার ভিতর ভাসিয়া উঠিল জ্যেষ্ঠা কন্যা উষার ম্লান মুখখানি। তাহাকে উপলক্ষ করিয়া হৃদয়হীন বৈবাহিক ও বৈবাহিকার নির্য্যাতন; শিক্ষাগত দীনতার জন্য জামাতা-বাবাজীর হৃদয়হীন আঘাত এবং তাহাতে মর্ম্মাহত বালিকার—ছোট বোনটির পরিণাম ভাবিয়া—পিতার নিকট আকুল মিনতি—'আশাকে তুমি পণ্ডিত ক'রো বাবা!'

আবার একটা নিশ্বাস বৃদ্ধের ভাঙ্গা বুকখানা যেন সবেগে নাড়া দিয়া বাহির হইয়া গেল। শূন্য বুকের ভিতর এবার ধীরে ধীরে আসিয়া দেখা দিল—আশা। আজ ইহাকে লইয়া কি নিদারুণ সমস্যাই তাঁহার জীবনে চলিয়াছে!

জ্যেষ্ঠা কন্যা উষাকে তিনি বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ দিতে পারেন নাই, সে ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত তো আশাকে উপলক্ষ করিয়াই সমাধা হইয়াছে। কিন্তু হিসাব নিকাশ করিয়া আজ লাভের দিকে কি তিনি পাইয়াছেন? যাহার শিক্ষার অভাব একদিন অভিযোগ তুলিয়াছিল, আজ তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সে কন্যা আজ স্বামী-সংসারে গৃহিণীর আসনে বসিয়াছে, পুত্র-কন্যা হইয়াছে, এখন তাহাকে সুখীই বলিতে হইবে। ইহা কি লাভ নহে?

কিন্তু আশা? পরীক্ষায় এ অঞ্চলের সকল ছেলেকে পিছাইয়া দিয়া সে সবার উপরে উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার বিনিময়ে তিনি কি পাইয়াছেন? লোকনিন্দা, বিদ্রূপ, প্রতিপদে প্রচুর বিঘ্ন-বাধা। পক্ষান্তরে

এই শিক্ষার প্রভাব কন্যার সহজাত সহনশীলতাকেও এমনই শিথিল করিয়া দিয়াছে যে. সে বাঙ্গালার ছেলে নয—মেয়ে, এ কথা ভুলিয়া গিয়া সমাজেও সমান তালে ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিয়া চলিতে চায়। এই দোষেই ত সম্প্রতি অমন সম্বন্ধটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য ঘরে-বাহিরে কি গঞ্জনাই না তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে! দুঃস্বপ্নের মতই সেদিনের অপ্রীতিকর দৃশ্যটি তাঁহার মানস-পটে সহসা ফুটিয়া উঠিল।

নন্দমুহুরীর ছেলে অজিত সবান্ধবে আশাকে দেখিতে আসে। তাহাদের জিদ, একান্তে কন্যাকে দেখিবে ও আলাপ করিবে। ছেলের পিতাও এ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে—ছেলেদের এই ইচ্ছা এবং স্থান-বিশেষে আপত্তিকর হইলেও ইদানীং এই ব্যবস্থাই সহর-অঞ্চলে চালু হইয়াছে, সুতরাং এখানে যেন ইহাতে আপত্তি না উঠে। কিন্তু কন্যাই সর্ব্বাগ্রে আপত্তি করে, সুতরাং পিতার সঙ্গেই বাহিরের ঘরে তাহাকে দেখাইবার জন্য ব্যবস্থা করিতে হয়। আলাপ-আলোচনার সময় ছেলেদের শিষ্টাচারের কোনও পরিচয়ই পিতাপুত্রী যদিও পায় নাই, তথাপি ভবিষ্যৎ ও অবস্থার দিকে চাহিয়া পিতা তো তাহাদের আচরণ উপেক্ষাই করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা কঠিন হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠের রূঢ় কথায় যে তীব্র আঘাত তাহাদিগকে দিয়াছিল, পল্লী-অঞ্চলে কোন্ অবিবাহিতা কুলীন-কন্যার পক্ষে তাহ' সম্ভব? না-হয় ছেলেরা সিগারেটের কুণ্ডলীকৃত ধূম্রজালে ছোট ঘরখানির সহিত পিতা-পুত্রীর মুখ দুইখানিও কালো করিয়া দিয়াছিল এবং একটি ছেলে সিনেমার কোনও এক পরিচিতা অভিনেত্রীর মুখের সাদৃশ্যটুকু শ্লেষের সুরেই ব্যক্ত করিয়াছিল! কিন্তু এগুলি উপেক্ষা করা কি এতই কঠিন ছিল? তাহার পর 'জানোয়ার' নামে যে ছবিখানা চিত্র-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহার প্রসঙ্গ তুলিয়া না-হয় কন্যাকে তাহারা প্রশ্ন করিয়াছিল—ছবিখানা সে দেখিয়াছে কিম্বা দেখিবে কি না? কিন্তু

কন্যার কি উচিত হইয়াছিল এই বলিয়া সে-কথার উত্তর দেওয়া—'ছেলেদিগকে দেখিবার পর পুনরায় জানোয়ার দেখিবার প্রয়োজন আছে কি?' ইহাতেই ত সমস্ত ওলট্ পালট হইয়া যায়। উঃ! ছেলেদের কি রাগের ছটা, আস্ফালন! তার পর নন্দ মুহুরীর শাসানি—'দেখি, জানোয়ার ছাড়া কোন্ সমজদার রাজ-পুত্তুরের গলায় তোমার পাস-করা মেয়ে মালা দেয়!'—এই শাসনের প্রভাব পরবর্ত্তী কয়টি সপ্তাহের মধ্যে কত দিক দিয়া কত প্রকারেই ত তিনি উপলব্ধি করিতেছেন! কত বেনামা পত্র, কত কদর্য্য কবিতা ও ছড়া, কত প্রকার অপ্রিয় মন্তব্য আজ তাঁহার এই পাস-করা কন্যাটিকে উপলক্ষ করিয়া নিন্দা ও আতঙ্কের শিহরণ তুলিয়াছে! সুতরাং এ প্রশ্ন উঠা ত স্বাভাবিক,—এ দিক্ দিয়া কি তিনি পাইয়াছেন;—লাভ, না, লোকসান?

অতঃপর কলিকাতায় যে ছেলেটির সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, আজই তাহার একটা নিষ্পত্তি হইবে—এই আশাটুকু লইয়াই তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলেন। ইহাও সঘর এবং পাত্রপক্ষের অবস্থাও স্বচ্ছল। সর্ব্বপ্রকারে দুইটি হাজারের সহিত তাঁহার পাস-করা মেয়েটিকে এই ঘরে তুলিয়া দিবার জন্য কয়টি সপ্তাহ ধরিয়া কি সাধ্য সাধনাই তিনি করিয়াছেন! কিন্তু সে সমস্তই উপেক্ষা করিয়া নিষ্ঠুর গৃহস্বামী আজ তাঁহাকে সুস্পষ্ট জানাইয়াছেন,—'অত অল্পে ইহার কোন সম্ভাবনাই নাই। মেয়েকে পাস করালে ছেলের দর নামে না, বরং মেয়ে পাস ক'রেছে ব'লে তার বাবুয়ানির জন্য আরো কিছু ধরে দিতে হয়!'

এখনও এমন মনোবৃত্তি যে সমাজে, তিনি সেখানে সকলের কথা উপেক্ষা করিয়া মেয়েকে উচ্চশিক্ষার পথে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন! বাড়ীতে ফিরিয়া কেমন করিয়া তিনি এ পক্ষের উপেক্ষার এই কঠোর নির্দ্দেশটুকু প্রকাশ করিবেন! তাঁহার মনে হইতেছিল, ট্রেণখানি যদি আজ আর

কুলিনপুরের দিকে না যায় কিম্বা পথে এমন একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে যে—

দুর্ঘটনার মতই একটা বিদ্রূপাত্মক তীক্ষ্ণ স্বর সামনের দিকের এক বেঞ্চি হইতে আসিয়া নিবারণ গাঙ্গুলীর দুশ্চিন্তার জালটুকু হঠাৎ ছিন্ন করিয়া দিল!

—ও গাঙ্গুলী মশাই, পাশ-করা মেয়ের বিয়ের কি হ'ল?

ব্যথার স্থানে আঘাত পড়িলে আর্ত্তও সচেতন হইয়া উঠে। গবাক্ষের উপর হইতে অবসন্ন মাথাটি তুলিয়া নিবারণ গাঙ্গুলীও অতঃপর সোজা হইয়া বসিলেন। দুই হাতে দুই চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া দেখিলেন, ট্রেণখানা সবেগেই ছুটিয়াছে; ট্রেণের সুদীর্ঘ কামরাটিও পরিচিত অপরিচিত বিবিধ যাত্রীতে ভরিয়া গিয়াছে এবং সামনের দিকে একটু দূরে একখানি বেঞ্চিতে পাশাপাশি কয়টি ছেলে মাথা তুলিয়া তাঁহারই দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে। কথাটি যে ইহাদেরই একজনের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়াছে—ইহা নির্ণয় করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু ইহারা যে অনেকক্ষণ ধরিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে অনুচিত আলোচনা করিতেছিল এবং এই অপ্রিয় আলোচনা অনেকের উপভোগ্য হইলেও, ইহাদের ঠিক সম্মুখে উপবিষ্ট একটি যুবক-যাত্রীর অতিশয় অপ্রীতিকর হইতেছিল—বৃদ্ধ কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন?

ছেলেরা বুঝিল যে, নিবারণ গাঙ্গুলীর তন্দ্রার ঘোর কাটিয়াছে। প্রকাশ্য ভাবে আঘাত করিবার এই উপযুক্ত ক্ষণ! তৎক্ষণাৎ চারিটি ছেলের মধ্যে একটা পরামর্শ হইয়া গেল এবং একটি ছেলে সঙ্গে সঙ্গে সবেগে উঠিয়া নিবারণ গাঙ্গুলীকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল,—নেবুতলার ছেলে কি কয়?

আর একটি ছেলে ইহার হাতে একটা টান দিয়া কহিল,—কি আর কইবে—কদমতলা দেখায়!

চারিজনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিবারণ গাঙ্গুলীর মুখখানা নিমেষে কালো হইয়া গেল। ছেলে কযটীকে তিনি চিনিযাছিলেন। যে ছেলেটি উঠিয়া নেবুতলার কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহারই নাম অজিত ; নন্দ মুহুরীর পুত্র। কিন্তু তাহার কথাটা যেন নিবারণ গাঙ্গুলীকে স্তব্ধ করিয়া দিল। তিনি যে নেবুতলার ছেলে দেখিতে গিযাছিলেন ও সেখান হইতে একটা কঠোর নির্দ্দেশ লইয়া ভগ্নদেহে ফিরিতেছিলেন, এ সংবাদ এই ছেলেটি জানিল কিরূপে ! বুঝিলেন, নন্দ মুহুরী দূষিত বাযুব মতই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিতে সচেষ্ট, তাঁহার আর নিস্কৃতি নাই !

আবার ছেলেদের পরামর্শ এবং পবক্ষণে অজিতের সবেগে উত্থান। এবার সে পবামর্শ-প্রসূত চরম অস্ত্রটিই নিবারণ গাঙ্গুলীর উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল,—এক কাম করেন মশাই, আপনার পাস-করা মেযেটিকে সিনেমায পাঠান, পয়সাও-ঘরে আসবে, বিয়ার ভাবনাও কাটবে !—সঙ্গীরাও সোল্লাসে সায দিল,—হঃ ! আবার বিপুল কলহাস্য।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একটা অতি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ইহাদের কলহাস্যকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া ট্রেণের আরোহী-দিগকেও স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। ইহাদেরই পূরোভাগে যে ছেলেটি এতক্ষণ স্থির হইয়াই বসিয়া ছিল, অজিতের শেষের অভদ্র ইঙ্গিতে সহসা তাহার ধৈর্য্যের বাঁধনটুকু ছিন্ন হইয়া গেল। নিজের স্থানটিতে বসিযাই সেই দুঃসাহসী ছেলেটী তাহার স্বাস্থ্যপুষ্ট নিটোল দীর্ঘ দেহটী উন্নত করিয়া অজিতের হাস্য-মুখর মুখখানির উপর এমন একটি থাপ্পড় দিল যে, চশমাখানিও তাহাতে যেন ভয় পাইয়া দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখখানাকে চাপিয়া গুলীবিদ্ধ পাখীটির মত অজিতকে লুটাইয়া পড়িতে হইল।

অপর তিনটি ছেলে একসঙ্গেই রুখিয়া প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করিল,—মারলেন যে বড় ?

সহজ কণ্ঠে ছেলেটি কহিল,—আগে চশমাখানা তুলে আনো ; এখনি কেউ মাড়িয়ে দেবে।

ছেলেদের মনে হইল, কলেজের কোনও প্রফেসর যেন তাহাদিগকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতেছে। একটি ছেলে তৎক্ষণাৎ উঠিতেই, পার্শ্বের বেঞ্চির এক যাত্রী তাড়াতাড়ি চশমাখানি তুলিয়া তাহার হাতে দিল।

ইতিমধ্যেই অজিত পকেট হইতে এসেন্স-মাখা রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে আহত মুখখানা আবৃত করিয়াছিল। চক্ষুতে চশমা লাগাইবার জন্য রুমালটি মুখ হইতে তুলিতেই দেখা গেল, তাহার কিয়দংশ রক্তে সিক্ত হইয়াছে। রক্ত দেখিয়াই ছেলে কয়টির দেহের রক্ত পুনরায় গরম হইয়া উঠিল, কহিল,—দেখেছেন কাণ্ড, কি ক'রেছেন ? আমরা আপনাকে পুলিসে দেব !

অজিত তাহার আততায়ীর হাতের পরশেই তাহার দেহের শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল। সুতরাং এ দিক্ দিয়া ইহাকে পরাস্ত করা তাহাদের মিলিত শক্তিতেও দুঃসাধ্য বুঝিয়া, সে অন্যদিক্ দিয়া তাহাকে ত্রাসিত করিতে সচেষ্ট হইল। দুই চক্ষু পাকাইয়া সে এবার উষ্ণকণ্ঠে কহিল,—কার গায়ে হাত তুলেছেন,—জানেন আমি কে ?

ছেলেটি নির্ব্বাক্! তাহার ওষ্ঠপ্রান্তের হাসিটুকু যেন ইহাদের সকল আস্ফালনই উপেক্ষা করিতে চাহিল।

অজিত এবার রুখিয়া উঠিয়া ইংরাজীতে কহিল,—আই উইল সী ইয়ু!—গীভ মী ইয়োর নেম য়্যাণ্ড য়্যাড্রেস।—(তোমাকে দেখে নেব আমি—তোমার নাম ঠিকানা আমাকে দাও)

ছেলেটি তাহার মুখের হাসিটুকু কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল,—ইংরিজী

ব'ললেন, তাই কথাটা তুলছি ;—ওদেশে এ রকম অবস্থায় নামের কার্ড চায় কেন, জানেন ?

একটি ছেলে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিল,—ক্যান্ ?

আর একটি ছেলে কথাটার অর্থ বুঝিয়া সঙ্গীর গায়ের পাঞ্জাবীর হাতাটায় টান দিয়া কহিল,—থাম্।

ছেলেটি ইতিমধ্যে তাহার কোটের পকেট হইতে নিজের নাম-ছাপানো সুন্দর কার্ডখানি বাহির করিয়াছিল। অজিতের মুখের উপর এই সময় সেখানি তুলিয়া কহিল,—হিয়ার ইট্ ইজ—প্লীজ! মাইণ্ড হ্যাট্—নট এ ওয়াণ্ডারিং য়ু আই য়্যাম!

পরক্ষণে কার্ডখানা অজিতের কোলের উপর নিক্ষেপ করিয়া ছেলেটি কহিল,—আদালতের সমন কিম্বা যুদ্ধের নিমন্ত্রণ—আমি দুটোরই প্রতীক্ষা ক'রব, জানবেন।

অজিত কার্ডখানা তুলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই দুই পাশ হইতে তাহার সঙ্গীরাও সেদিকে ঝুঁকিল এবং একসঙ্গেই চারিজোড়া চক্ষুই সহসা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; ঐ মসৃণ ছোট কার্ডখানায় ছাপা নামটা যেন সহসা সাপের মত কিলবিল করিয়া তাহাদের চক্ষুর উপর ফণা উদ্যত করিল!

ট্রেণের কামরার মধ্যে নিবারণ গাঙ্গুলীর চিন্তাচ্ছন্ন চিত্তে সহসা উদয় হইয়াছিল,—যদি ট্রেণখানা সেদিন কুলিনপুরে না যায় কিম্বা পথে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে!—

পরক্ষণেই ট্রেণের ভিতর যে ঘটনার সৃষ্টি হয় তাহাকেই উপলক্ষ করিয়া রহস্যময়ী নিয়তি যেভাবে পরবর্তী পরিস্থিতির সৃষ্টি করিলেন, নিবারণ গাঙ্গুলীর কল্পনা অপেক্ষা তাহা কি অল্প রোমাঞ্চকর ছিল ?

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে সুসজ্জিত ঘরে উত্তম পালঙ্কে স্থূল

ও কোমল শয্যায় শায়িত অবস্থায় নিবারণ গাঙ্গুলীও বুঝি মনে মনে ইহাই ভাবিতেছিলেন।

ট্রেণের সেই অপ্রীতিকর ঘটনা তখনও বুঝি তাঁহার চক্ষুর উপর ছবির মত ভাসিতেছিল। ট্রেণখানা ষ্টেশনে আসিয়া থামিতেছে, তাহাও তাহার মনে আছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া তিনি ট্রেণ হইতে নামিবার জন্য প্লাটফর্মটির দিকে ঝুঁকিয়াছেন, সেটুকুও মাথায় আছে, কিন্তু তাহার পরেই মাথাটা ঘুরিয়া যায় এবং তাহার পরের কথা কিছুই আর স্মৃতির পথে দেখা দেয় না।

সেই সুপ্ত স্মৃতি আবার আজ জাগ্রত হইয়াছে। দুই চক্ষুর পল্লব খুলিতেই দেখিতে পাইলেন, পদতলে কন্যা আশা বসিয়া আছে। সুন্দর মুখখানি তাহার বিমর্ষ; কিন্তু তাঁহাকে চাহিতে দেখিয়া সে মুখখানি যেন তখনই হাসিতে ভরিয়া গেল, অপর কাহাকে লক্ষ্য করিয়াই যেন কহিল, —ঐ দেখুন, বাবা চেয়েছেন! পরক্ষণেই তাহার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিয়া উঠিল —বাবা?

তখন মাথার দিক্ হইতে কে যেন নামিয়া খাটের পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। নিবারণ গাঙ্গুলী তাহাকে দেখিয়াই চিনিলেন, মুখখানিও বুঝি সেই সঙ্গে বিহসিত হইয়া উঠিল। এ যে সেই অদ্ভুত ছেলেটি, ট্রেণে তাঁহার মুখরক্ষা করিতে দুর্ম্মুখ অজিতের মুখখানা যে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল —সেই অপরিচিত সাহসী ছেলেটি! কিন্তু তখনও স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি কেন এখানে এবং এ সব যোগাযোগ কেমন করিয়া হইল?

ছেলেটি নিবারণ গাঙ্গুলীর মনের অবস্থাটুকু উপলব্ধি করিয়াই সংক্ষেপে অতীতের যে সংবাদটুকু শুনাইয়া দিল, তাহার অর্থ এইরূপ।—ট্রেণ হইতে নামিবার সময় গাঙ্গুলী মহাশয় মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ছেলেটি কাছেই থাকায় কোন রকমে তাঁহাকে নিজেদের বাড়ীতেই আনিয়া ফেলে।

ইহাদের বাড়ী ষ্টেশনের সান্নিধ্যে। পরে সে নিজেই গাড়ী লইয়া তাঁহার বাড়ীতে যায় এবং আশা ও তাহার মাকে এ বাড়ীতে লইয়া আসে। তাঁহারা এখানেই আছেন। উষা ছেলেপুলেদের লইয়া যদিও সেখানে দেখাশুনা করিতেছে কিন্তু এখান হইতেই তাহাদের তত্ত্বাবধান করা হইতেছে। এক সপ্তাহ চিকিৎসার পর আজ এইমাত্র গাঙ্গুলী মহাশয় চক্ষু মেলিয়াছেন। কিন্তু ব্যাধির দিক্ দিয়া তিনি এক্ষণে নিরাপদ্।

নিবারণবাবু নীরবেই সমস্ত শুনিলেন, কথা কহিবার মত বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য তখনও তাঁহার স্বাস্থ্যে সঞ্চিত হয় নাই। ছেলেটিও তাহার সংবাদগুলি এমন কায়দায় ও এরূপ সন্তর্পণে তাঁহাকে শুনাইয়া দিল যে, উত্তেজনার কোন সম্ভাবনা বা প্রশ্ন করিবার কোনও সুযোগই তিনি প্রাপ্ত হন নাই। কথাগুলি শেষ করিয়া রোগীকে কথা কহিতে নিষেধ জানাইয়া পরবর্ত্তী ঔষধটির সম্বন্ধে আশাকে সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ দিয়াই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

পিতার দৃষ্টিতেই তাঁহার প্রশ্ন পাঠ করিয়া আশা কহিল,—ইনি একজন খুব নামী ডাক্তার, এই বয়সেই বিখ্যাত হ'য়েছেন। আপনি বোধ হয় এঁর নাম শুনে থাকবেন—ডাঃ বি, ব্যানার্জ্জী; এম-বি, এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, লণ্ডন; মেডিকেল কলেজের এনাটমীর প্রফেসর।

ছেলেটির পরিচয় শুনিয়া নিবারণ গাঙ্গুলীর দুই চক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—ট্রেণের মধ্যে সেই কয়টি দুর্ম্মু'খ ছেলের বিস্মিত মুখভঙ্গি; এই ছেলেটির কার্ডখানি দেখিবামাত্র তাহাদের কয়খানি মুখই একসঙ্গে ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গিয়াছিল কেন, এতক্ষণে তিনি তাহা উপলব্ধি করিলেন।

আশা বুঝিল, এখানকার সম্বন্ধে পিতার কৌতূহল এখনও প্রশমিত হয় নাই। সে তখন অবশিষ্টটুকু, যাহা ডাক্তার বিভূতিবাবু উহ্য রাখিয়া-

ছিলেন, শেষ করিয়া দিল। কহিল,—বাড়ীর কর্ত্তাকেও আপনি হয়ত জানেন বাবা, গবর্ণমেণ্টের ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্টের ইন্‌চার্জ্জ ছিলেন, এখন পেন্‌সন নিয়েছেন। এঁর নাম রায় বাহাদুর পঞ্চানন ব্যানার্জ্জী,—ভারি ভাল লোক বাবা, কে ব'লবে যে এই লোক অত বড় একটা ডিপার্টমেণ্ট চালিয়ে এসেছে, মুখে হাসিটুকু লেগেই আছে। আমাকে যে কি চোখে দেখেছেন আর কি ভালোই বাসেন—কি ব'লবো!

নিবারণ গাঙ্গুলী এবার আস্তে আস্তে কহিলেন,—মস্ত লোক মা, খুব জানি; কিন্তু উনি এখানে—

আশা তাড়াতাড়ি কহিল,—আমি ব'লছি বাবা, আপনি কথা কইবেন না। কলকেতার বাড়ী ওঁদের ইম্‌প্রুভমেণ্টে পড়েছে ব'লে, এই বাড়ীখানাই পছন্দ ক'রে ক'রিয়েছেন। লোককে কিন্তু কিচ্ছু জানতে দেন নি। চুপি চুপিই গৃহপ্রবেশ হ'য়েছে, তবে শুনতে পাচ্ছি খুব ঘটা ক'রে দুর্গোৎসব হবে, তখন না কি আশে-পাশের সমস্ত গ্রামের লোকজন নেমন্তন্ন ক'রে আলাপ ক'রবেন। এই দেখুন না—এখুনি এলেন বলে!

একটু পরেই পদশব্দ শুনা গেল। কিন্তু যিনি আসিলেন, তিনি রায় বাহাদুর নন—গাঙ্গুলী মহাশয়েরই গৃহিণী। সহধর্ম্মিণীকে দেখিয়াই বৃদ্ধের দুই চক্ষুর প্রান্ত দিয়া অশ্রুর প্রবাহ বহিল, সঙ্গে সঙ্গে দুইটি কথা আর্ত্ত হইয়া বাহির হইল,—এমন হ'য়েছিল?

গৃহিণী কহিলেন,—মা দুর্গা মুখ তুলে চেয়েছেন, তাই পথের মাঝে অমন সহায় পেয়েছিলে। ওগো, কি ব'লবো, এরা বুঝি এ যুগের মানুষ নয়! এত বড়লোক হ'য়েও মেজাজ যে এত নীচু হয়, তা কখনো ভাবি নি।

আট

ইহার পর আরও তিনটি দিন অতীত হইয়াছে এবং এই তিনটি দিন এ বাড়ীর মানুষগুলিকে বড় আনন্দের ভিতর দিয়াই লইয়া গিয়াছে।

বিভূতি সেদিন মেয়েমহলে বসিয়াই হাসিমুখে নিজের সম্বন্ধেই মন্তব্য করিল,—আমার চিকিৎসাটা তাহ'লে সত্যই সার্থক হ'য়েছে।

আশাও সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তাহার দিকে চাহিয়াই সে কথাটা শেষ করিয়াছিল।

আশা কথাটা নীরবে মানিয়া লইল না, প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কহিল, খ্যাতির সবটুকু কিন্তু ডাক্তারের একচেটে প্রাপ্য নয়। আপনিই বলুন না মা?

বিভূতির মা এবং আশার মা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আশা কথাটা বিভূতির মাতা-ঠাকুরাণীকেই লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ আশার কথায় সায় দিয়া কহিলেন,—হাঁ মা, ঠিক্ কথাই তুমি ব'লেছ। বিভূ তো নানা দেশ ঘুরে এসেছে, দেশ-বিদেশের কত রকমের কত নার্স তো ওর চোখে পড়েছে, ওই বলুক—এ রকম সেবা আর ডাক্তারের এমন ক'রে সহায়তা ক'রতে কাউকে কোথাও দেখেছে? তবু আশা মা আমার হাসপাতালের ত্রিসীমাতেও কোনদিন যায় নি।

কন্যার প্রশংসার আনন্দ মনে মনে চাপিয়া আশার মা কহিলেন,—আপনি ত এ কথা ব'লবেনই, আশার কোন কাজেই আপনি কিছুই খুঁৎ দেখেন না, ওর সবই আপনার কাছে অপূর্ব্ব! কি চোখেই যে মেয়েকে দেখেছেন দিদি!

বিভূতির মা কহিলেন,—মেয়েদের চোখেই যে কষ্টি-পাথর দিদি, এতে

সবই ধরা যায় ; আসল মেকি—তুইই। সামনে ব'ললে হয়ত অন্য কিছু মনে হবে—তা হোক, তবু আমি বড় মুখ ক'রে ব'লতে পারি দিদি, আপনার মেয়ের মত মেয়ে আমার চোখে এ পর্য্যন্ত আর একটিও পড়েনি।

বিভূতি ইতিমধ্যেই উঠিয়া গিয়াছিল, আশাও তাহার মুখখানা রাঙা করিয়া জানালার দিকে সরিয়া গেল। ঠিক্ এই সময়ে বিভূতির অনূঢ়া ভগিনী ত্রয়োদশী কিশোরী মীনা আসিয়া মায়ের মুখের সামনে দাঁড়াইয়া কহিল,—তুমি যেন মা কি? আমার কথা বুঝি ভুলে গেছ,—আমার ওপরেও কি চোখ তোমার পড়েনি?

মা হাসিয়া কহিলেন,—না। কার সঙ্গে কার তুলনা! তুইই মিলিয়ে বল্ না—সব দিক্ দিয়ে?

মীনা কৃত্রিম অভিমানের ভঙ্গীতে কহিল,—আশা দিদি, শুনছ ত মার কথা! আর কেন এ কথা মা বল্‌ছেন, সেটাও বুঝেছ ত?

মা কহিলেন,—সে আর বুঝিয়ে কি হবে মা,—যা ভাবছিস্, তা হবার নয়।

মুখখানা ম্লান করিয়া মীনা মায়ের দিকে চাহিয়া কহিল,—কেন মা?

মা সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—আমরা যে মা ভাঙা!

ভাঙা!—গৃহিণীর এই বুকভাঙা কথাটা গাঙ্গুলী-গৃহিণীর পাঁজরার হাড় কয়খানিও বুঝি ভাঙিয়া দুইখানা করিয়া দিল।

ঠিক্ এই সময় কক্ষান্তরে হইতে নিবারণ গাঙ্গুলীর ক্ষীণ কণ্ঠনিঃসৃত স্বর অস্বাভাবিক উচ্চ পরদায় উঠিয়া আহ্বান আনিল,—আশা, ওরে—আশা!

এ আহ্বানে শুধু আশা নহে, কক্ষের সকলেই উঠি-পড়ি অবস্থায় কক্ষান্তরে ছুটিলেন।

*　*　*　*　*

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত শয্যাটি আশ্রয় করিয়া নিবারণ গাঙ্গুলী অতীত ও ভবিষ্যতের কত কথাই ভাবিতেছিলেন। সুষুপ্তির মধ্যেও কল্পিত স্বপ্ন কত মনোরম আলেখ্য অপূর্ব্ব রঙে রঞ্জিত করিয়া চিত্তের বিস্ময় তাঁহার নিবিড় করিয়া দিয়াছে। স্বপ্ন যদি মনের বিকার, অমূলক চিন্তারই দ্যোতক, তবে কেন তাহা প্রতি রাত্রেই তাঁহার সুপ্ত স্নায়ুর মধ্যে শিহরণ তুলিয়া আসিতেছে! তিনি ত ভবিষ্যতের এই মনোরম চিত্রটি চিন্তার তুলিতে মানসপটে কোনও দিন চিত্রিত করিতে সাহস পান নাই!

সর্ব্বদা বাঞ্ছিত একটী সুপরিচিত পদশব্দ ও সেই সঙ্গে স্নিগ্ধ কণ্ঠের সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ বৃদ্ধের চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া দিল।

—আজকের দিনটাও আপনাকে শুয়ে থাকতে হবে, কাল সকালেই উঠে ব'সবেন।

সুখস্বপ্নের স্মৃতি এবং সুপ্ত স্নায়ুমণ্ডলে উদ্ভাসিত মনোরম চিত্রখানি রুগ্নের চক্ষুর উপর এতক্ষণে কি প্রত্যক্ষভাবেই প্রকাশ পাইল?

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি কণ্ঠের স্বরে মনের কৃতজ্ঞতাটুকু সমস্ত প্রকাশ করিবার ভঙ্গিতে কহিলেন,—এখানে শুয়ে থেকেই তোমাদের যে সেবা পাচ্ছি বাবা, তাতে, সারা জীবনটা শুয়ে থাকতেও কষ্ট নেই। কি যত্ন, কিছুতেই ত্রুটি নেই।

বিভূতি কহিল,—আমি যখন ডাক্তার, আপনার পরিচর্য্যার ত্রুটি আমাদের কাছে না হওয়াই উচিত; আর এটা কর্ত্তব্য। বেশী কিছু করিনি আমরা।

নিবারণ গাঙ্গুলী কহিলেন,—এর বেশী আর কি হ'তে পারে বাবা? কোন রাজা-রাজড়ার ঘরেও এর বেশী পরিচর্য্যা হয় না। এখন ভাবছি, এ ঋণ কি ক'রে—

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর আর নির্গত হইল না। বিভূতিও তাঁহাকে অভিভূত

দেখিয়া সহসা কহিল,—দেখুন, বাবার সঙ্গে ত এ পর্য্যন্ত আপনার আলাপ হয়নি ; তাঁর ইচ্ছা সত্বেও আপনার স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে আসেন নি। আজ তাঁকে ব'লেছি, দেখা ক'রতে পারেন। বোধ হয় বাবা আসছেন।

কথাটা শেষ করিয়াই বিভূতি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

একটু পরেই এক সৌম্যমূর্ত্তি বর্ষীয়ান্ পুরুষ আস্তে আস্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিবারণ গাঙ্গুলী দ্বারের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, খ্যাতনামা পদস্থ পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বুঝি আলোড়িত হইতেছিল।

রায় বাহাদুর ঘরে ঢুকিয়াই কহিলেন,—নমস্কার গাঙ্গুলী মশাই, —কিন্তু আপনি যেন উঠে ব'সবেন না—সাবধান !

শেষের নির্দ্দেশটুকু যেন গাঙ্গুলী মহাশয়কে সতর্ক করিয়া দিল। শুধু যুক্ত হাত দুইখানি কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন,—নমস্কার।

তাহার পর শুষ্ক কণ্ঠকে কাশিয়া পরিষ্কার করিয়া কহিলেন,—দেখুন, অফিসে ঢুকে অবধিই আপনার নাম শুনিছি, তবে কাছে যেতে ভরসা কোনদিন পাইনি, এত তফাত সেখানে ছিল।

রায় বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন,—কিন্তু আজ ঠিক্ তার উল্টো, একেবারে পাশাপাশিই দুজনে এসে পড়েছি। কথাটা বলিয়াই তিনি খাটের কাছে যে চেয়ারখানি ছিল, তাহাতে বসিলেন ; মুখখানি কিন্তু খাটের উপর গাঙ্গুলী মহাশয়ের দিকেই রহিল।

নিবারণ গাঙ্গুলী অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবেই কহিলেন,—তখন কোনদিন আমাদের ঘরে এলে আমরা ডিপার্টমেণ্ট শুদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে আপনার অভ্যর্থনা ক'রতে বাধ্য ছিলুম,—কিন্তু আপনার ছেলেই আমার ওঠাটা বন্ধ ক'রে রেখেছেন—

রায় বাহাদুর কহিলেন, —আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন বলুন ত !

কাছারীর পোষাক আমরা ত অনেক আগেই দু'জনে খুলে ফেলেছি। নতুন ক'রে চেনাশোনা যখন হ'ল, আসুন এবার প্রাণ খুলে কথা কই। আপনি হয়ত জানেন না, আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রবার জন্য আমি কি রকম হাঁপিয়ে উঠেছিলুম।

—এটা হ'চ্ছে আপনার মত লোকের একটা আশ্চর্য্য রকমের অনুগ্রহ! আমরা যেটা কল্পনা ক'রতেও পারি না।

—বিলক্ষণ! এখনও আপনার সঙ্কোচ কাটছে না?

—কি ক'রে সংস্কারমুক্ত হই বলুন, রায়বাহাদুর! আফিসের কথা না হয় ছেড়ে দিলুন, কিন্তু এখনও যা দেখছি, মন তাতে ভরে গেছে। এতগুলো দিন গোষ্টিশুদ্ধ পড়ে আছি, মনে আপনাদের কারুর বিকার নেই, কষ্ট নেই—

—কষ্ট! আপনি জানেন না গাঙ্গুলী মশাই, আপনাকে উপলক্ষ ক'রে কত বড় আনন্দ আমি পেয়েছি।

নিবারণ গাঙ্গুলী এ কথাটার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, দৃষ্টিতে বিস্ময় ও প্রশ্ন ভরিয়া বক্তার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুর কহিলেন,—দেখুন, মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে যেটা ভাবে, তাতে বিঘ্ন দেখা দিলেও, শেষ কিন্তু সেটা ঠিক্ ঘটে যায়। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রবার ভারি ঝোঁকই আমার হ'য়েছিল। কেন শুনবেন? তার মূলে কিন্তু আপনার ঐ লক্ষ্মী মেয়েটী।

নিবারণ গাঙ্গুলী নীরবেই রায়বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মুখে তাঁহার বাণী ফুটিল না।

রায় বাহাদুর কহিলেন,—ম্যাট্রিক পাশের খবরটায় সত্যিই ভারি আশ্চর্য্য হ'যে যাই। এ অঞ্চলের একটা ছেলের নামও গেজেটে উঠল না, অথচ এই মেয়েটির নাম একেবারে—টপে! কাজেই মনে একটা কৌতূহল

জেগেছিল। খুবই ইচ্ছে হ'য়েছিল মেয়ের বাবার সঙ্গে আলাপ ক'রতে আর মেয়েটিকে দেখতে।

নিবারণ গাঙ্গুলী কহিলেন,—কিন্তু সে সৌভাগ্য ত আমার হয়নি রায় বাহাদুর! যদি গরীবের কুঁড়েয় এই সূত্রে পায়ের ধূলো পড়তো—

রায় বাহাদুর কহিলেন,—আপনি কি এখনও মনে করেন গাঙ্গুলী মশাই, সবই আমাদের হাত-ধরা? যে সব ইচ্ছা আমরা করি, তার সব-গুলোই কি মেটাতে পারি!—যাব-যাব ক'রছি যখন, শুনলুম—নন্দবাবুর ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের কথাবার্ত্তা চলেছে, কাজেই আর যাই নি, কেমন একটা সঙ্কোচ এসে গেল।

—কিন্তু সে সম্বন্ধের পাট চুকে গেছে রায় বাহাদুর!

—তাও শুনেচি। আপনি হয়ত শুনে অবাক্ হ'য়ে যাবেন, তন্ন তন্ন ক'রে এদিক্‌কার খবর আমি এত বেশী পেয়েছি, আপনিও ততটা পান নি।

নিবারণ গাঙ্গুলী পুনরায় স্তব্ধ হইলেন এবং দুই চক্ষুর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি রায় বাহাদুরের মুখখানির দিকেই নিবদ্ধ করিলেন।

রায় বাহাদুর কহিলেন,—কিন্তু দেখুন নিয়তির নির্ব্বন্ধ, যে ইচ্ছাটুকু মনে উঠেছিল, প্রকারান্তরে তা'ই সিদ্ধ হ'ল। এতে আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এইটুকু, আপনার মেয়েটির সম্বন্ধে আমি যতটুকু ধারণা ক'রেছিলুম—এখানে তাকে এমন ক'রে পেয়ে, তার প্রকৃতির সব দিক্‌গুলো রীতিমত দেখে বুঝলুম, সে আমার ধারণার অনেক ওপরে।

নিবারণ গাঙ্গুলী নির্ব্বাক্ অবস্থায় রায় বাহাদুরের কথা শুনিতেছিলেন, নিজ কন্যার প্রশস্তি সম্বন্ধে তাঁহার বলিবার কি থাকিতে পারে!

রায় বাহাদুর কহিলেন,—কাজেই এমন কন্যার যিনি পিতা, তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়টাও কি সৌভাগ্যের কথা নয়, গাঙ্গুলী মশাই!

কিন্তু এই বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তির এই প্রশস্তি নিবারণ গাঙ্গুলীর

মস্তিষ্কের মধ্যে তৎক্ষণাৎ বুঝি অতীত দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনাগুলি নিদারুণ দাহের সঞ্চার করিল। কণ্ঠের স্বরে উত্তেজনা প্রকাশ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন,—অমন কথা ব'লবেন না রায় বাহাদুর! যদি আপনি জানতেন, সমাজে আমি আজ কতটা হেয়, মেয়ের এই শিক্ষার জন্য আমি নিজেকে কতটা দুর্ভাগ্য—

রায় বাহাদুর কহিলেন,—আমি সে সমস্তই শুনেছি। আপনার কন্যা স্পষ্ট কথা ব'লেছিল, সে জন্য সব দিক্ দিয়ে আপনাকে জব্দ ক'রবার চেষ্টা চ'লেছে। আর আপনার মেয়েরও দুর্জ্জয় জেদ, কিছুতেই সে আপনাকে ছোট হ'তে দেবে না।

নিবারণ গাঙ্গুলী সবেগে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, —তার এই জেদের কি কোনো দাম আছে রায় বাহাদুর!

দৃঢ়স্বরে রায় বাহাদুর কহিলেন,—নেই? আজ আমাদের সমাজের মেয়েগুলো যদি এমনই জেদ দেখাতে পারতো, তাহ'লে মেয়ের বাবা কখনই এত ছোট হ'য়ে থাকতো না। আপনি নিজেকে ছোট ভাববেন কেন —বলুন ত?

—নন্দবাবুর ব্যাপার জেনেও একথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন রায় বাহাদুর?

—সমাজে সবাই কি নন্দবাবু, গাঙ্গুলী মশাই?

—তাই। ছেলের বিয়ে দেবার সময় সকলেই নন্দবাবু হ'য়ে দাঁড়ায়, হয় ত উনিশ-বিশ, কিন্তু কাঠামো একই।

রায় বাহাদুরের মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন,—ভালো মেয়ে পাওয়াটাও এত বড় ভাগ্যের কথা যে, সব জায়গায় ছেলের বাবা হয় ত নন্দবাবু না হ'তেও পারেন। এই নিজের কথাই ব'লছি, আমার ছেলেটিকে ত দেখেছেন, পরিচয়ও পেয়েছেন। কিন্তু শুনলে বিশ্বাস ক'রবেন না, তিন বছর ধ'রে ওর যোগ্য

একটি পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছি—নন্দবাবু হ'য়ে নয়—প্রার্থী হ'য়েই, কিন্তু পাইনি গাঙ্গুলীমশাই।

আবার নিবারণ গাঙ্গুলীর দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একটু অস্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন,—বলেন কি? আপনার সোনার টুকরো ছেলে তার—

—বুঝুন। আপনার হীরের টুকরো মেয়েকে নিয়ে আপনার যে দশা, আমারও তাই। সুকন্যা পাওয়াটা কি এতই সহজ ভাবেন! যাঁরা যথার্থ কন্যাই চান, অন্য উপসর্গগুলো বাদ দিয়ে।

কিছুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ। যে দুরাশা কয়দিন ধরিয়া গাঙ্গুলী মশায়ের স্নায়ুমণ্ডলে ধীরে ধীরে হিল্লোলিত হইতেছিল, সহসা তাহারই একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কি তাঁহাকে সচকিত ও সপ্রতিভ করিল? আলোচনার সুযোগটুকু গ্রহণ করিয়াই তিনি কহিলেন,—কিছু মনে ক'রবেন না, একটা কথা জানতে আগ্রহ হ'চ্ছে, আপনি কি এখনো 'স্বভাব' আছেন—ভঙ্গ নন?

রায় বাহাদুর ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—লোকাচারের বেড়াটি অনেক আগেই আমার প্রপিতামহ ভেঙ্গে দিয়ে গেছেন, তবে মানুষের সত্যিকার স্বভাব বা মনোবৃত্তি যাই বলুন, সেটুকু তাঁরা বরাবর আস্তই রেখেছেন, আমিও এ পর্য্যন্ত সেইটুকু রক্ষা ক'রেই চলেছি।

একটা বড় সমস্যার অল্প কথায় এই সংক্ষিপ্ত সমাধান কৌলীন্য-প্রথার এত বড় রক্ষণশীলকে যেন স্তব্ধ করিয়া দিল। কিন্তু তখনও বৃদ্ধের চিত্তগত কৌতূহলটুকুর নিবৃত্তি হয় নাই। তাই পুনরায় প্রশ্ন তুলিলেন,—তবুও জানতে পারি রায় বাহাদুর, আপনার ঐ রূপে গুণে সব রকমের সেরা ছেলেটির সম্বন্ধে কি রকম পণ—

রায় বাহাদুরের প্রশান্ত মুখমণ্ডলে বিরক্তি-অস্বস্তির একটা গভীর ছায়া পড়িল। কণ্ঠের স্নিগ্ধ স্বরও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া আবেগের সহিত নির্গত হইল,—পণ! ছেলেকে যথাসাধ্য সুশিক্ষাই দিয়েছি, তার মর্য্যাদাও সে রেখেছে। জীবিকার যে ব্রত সে বেছে নিয়েছে, জনসমাজের কল্যাণও তার অঙ্গ। সেই ছেলের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী সংগ্রহের জন্য পণের দাবী ক'রব আমি! তাহ'লে নন্দবাবুর সঙ্গে কি তফাৎ আমার থাকে? দেখুন, সংস্কারের দিক্ দিয়ে আমি 'স্বভাব' না হ'তে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের স্বভাবটুকু আমরা বংশানুক্রমেই আঁকড়ে ধ'রে রেখেছি।

নিবারণ গাঙ্গুলীর মনে হইল, এতদিনে একটা বড় রকমের ভুল তাঁহার ভাঙিয়া গেল। রায় বাহাদুরের প্রতি কথাটি তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলে ঢুকিয়া পুনরায় সবেগে যে হিল্লোল তুলিল, তিনি তাহাতে অভিভূত হইয়াই সহসা কহিয়া উঠিলেন,—আমাকে ক্ষমা ক'রবেন রায় বাহাদুর, আপনার কথা আমি ঠিক ধ'রতে পারি নি; আবার মুখ ফুটে ব'লতেও সাহস পাই নি,—কিন্তু আর থাকতে পারছি না,—আশাকে যখন সোনার চোখে দেখেছেন, তখন—

স্বর আবার এখানে রুদ্ধ হইয়া গেল। রায় বাহাদুর তৎক্ষণাৎ অসমাপ্ত উক্তিটুকুর অর্থ উপলব্ধি করিয়া কহিলেন,—কিন্তু গাঙ্গুলী মশাই, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যে—ভাঙা!

ভাঙা?—নিবারণ গাঙ্গুলী দুই হস্তে বিপুল উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত বক্ষ চাপিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—সে ভুল আমার ভেঙে গেছে রায় বাহাদুর!

পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া তিনি ডাকিলেন,—আশা,—ওরে আশা!

দমকা বাতাসের মত কক্ষ মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া আশা উত্তর দিল,—বাবা!

দুর্ব্বল হাতখানা তুলিয়া রায় বাহাদুরকে নির্দ্দেশ করিয়া উল্লাসে গদ্ গদ্ স্বরে নিবারণ গাঙ্গুলী কহিলেন,—গলায় কাপড় দিয়ে গড় কর মা, আমি একটি বিরাট্ পুরুষের সন্ধান পেয়েছি, যার কোনোখানটাই ভাঙা নয়।

রেখার অনুভূতি

কিশোর বয়সেই রেখা লেখা-পড়ায় বিস্ময়কর উন্নতি করিয়াছে। এই উন্নতির মূলে তাহার বাবা অকাতরে অজস্র অর্থ ঢালিয়াছেন এবং এখনও ঢালিতেছেন, এ কথা যেমন সত্য; রেখার অসাধারণ মেধা ও অধ্যয়নে অদম্য ইচ্ছা তাহার বাবার এই বিপুল অর্থব্যয় যে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বেখার বাবা বাড়ীতেই তাঁহার এই আদরিণী কন্যাটির জন্য যেন স্কুল বসাইয়া দিয়াছেন। ইংরেজীব মাষ্টার আসিযা তাহাকে ইংরেজী পড়ান, গণিতে অভিজ্ঞ এক শিক্ষক অঙ্কের শিক্ষা দেন, জনৈক ঐতিহাসিক ইতিহাস পড়ান, লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক প্রধান সাহিত্যিক রেখাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের রসাস্বাদন করান। অন্যান্য বিষয়গুলি শিক্ষা সম্বন্ধেও সুব্যবস্থা আছে। যথা—ভূগোল, বিজ্ঞান, গান প্রভৃতি।

রেখার বাবার এখন খুব নাম-ডাক। একে ত তিনি বংশানুক্রমে জমিদার, বড় মানুষ; পরম সুখেই শৈশবজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, ধনীর ঘরের আদরের দুলালদের মত বহু পরিজন ও অনুচরদের সতর্ক দৃষ্টিতে "মানুষ" হইয়াছেন। এখন নিজেই ষ্টেটের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া আপনার বিপুল অর্থের ক্ষমতায় দেশের ভাগ্যবিধাতাদিগের এক জন হইয়া বসিয়াছেন। এমন সম্মান এ বংশে এ পর্য্যন্ত কেহ পান নাই; আর ক্ষমতাও কি অল্প? দেশের লোকের অদৃষ্ট লইয়া ছিনিমিনি যাঁহারা খেলিতে পারেন, ইনিও তাঁহাদিগের এক জন।

এই বংশের সকল ভূস্বামী বরাবর "বাবুই" ছিলেন, সরকারী খেতাবের কোন পরোয়াই তাঁহারা করিতেন না; প্রজারা জানিত, এই জমিদার-বাবুরাই তাহাদিগের রাজা, তাই তাহারাও প্রাণ খুলিয়া ইঁহাদিগকে "রাজা বাবু" বলিয়া রাজমর্য্যাদাই দিত। কিন্তু সরকারের সুনজরে পড়িয়া রেখার বাবা এখন "সার" হইয়াছেন। "রাজা বাবু" বলিলে, রাগিয়া

উঠেন। তুচ্ছ প্রজাদিগের দেওয়া একটা বে-সরকারী উপাধি তিনি মানিয়া লইবেন! কাযেই এখন সেরেস্তার চিঠিপত্র বা দরখাস্তের মুসবিদায় লিখিতে হয়—"স্যার"। কিন্তু অশিক্ষিত প্রজারা কথাটা যথাযথ উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহারা তাহাদিগের পদস্থ ভাগ্য-বিধাতার উদ্দেশে বলে—"ছার!"

সে যাহাই হউক, রেখার বাবাকে "সার" না বলিলে তিনি যখন বিরক্ত হন, রাগ করেন, তখন আমরা তাঁহাকে "সার"ই বলিব। "সার" বলিলেই বুঝিতে হইবে, রেখার বাবা।

বাঙ্গালা দেশের নানা জিলাতেই "সাবের" জমিদারী। সেইগুলির মধ্যে বিলাসপুর নামক তালুকটি কলিকাতার কাছাকাছি; কল কারখানা, মিউনিসিপালিটী, হাইস্কুল, লাইব্রেরী, দোকান-পাট, গঞ্জ, গঙ্গা প্রভৃতির সমাবেশে ইহার সমৃদ্ধি প্রচুর।

সম্প্রতি বিলাসপুব হাইস্কুল পরিচালকদিগের বিশেষ পীড়াপীড়িতে "সার" স্কুলটি পরিদর্শন করিতে যাইবেন সম্মতি দিয়াছেন।

যাইবার দিন রেখা বাবার নিকট আব্‌দার করিল,—বাবা, আমি ত কখনো কোন স্কুলে যাইনি, আমাকে নিয়ে চলুন না ওখানে; আমি স্কুল দেখব, স্কুলের ছেলেরা কেমন পড়াশুনা করে—তাও দেখব।

সার মেয়ের সকল আবদার রাখিলেও তাহার এ দিনের কথাটা তাঁহার মনে ধরিল না। তিনি কহিলেন,—না, বেবী, এটা ঠিক হবে না। পাড়াগাঁয়ের স্কুল, ছেলেগুলো সভ্যতা জানে না; যত সব গাধা পিটে ওখানে 'মানুষ' ক'রবার চেষ্টা চলেছে; তোমার ভাল লাগবে না, বেবী। বরং ক'লকাতার কোন ভাল স্কুল থেকে এর পর ডাক এলে তোমাকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।

বাবার কাছে বেবীর সাত খুন মাপ; বেবীর উপর তাঁহার প্রচুর ভরসা।

বাবার শেষের কথাটা রেখার ভাল লাগিল না, আগের কথাগুলাই মনে তালগোল পাকাইতেছিল। পাড়াগাঁয়ে ভাল ছেলে থাকে না, সবাই অসভ্য, তাহারা গাধা! কিন্তু সে ত কেতাবে পড়িয়াছে, ছোট হইতে যাঁহারা বড় হইযাছেন, তাঁহাদিগেব প্রায সকলেই পাড়াগাঁয়ের ছেলে! তবে?

কিন্তু মনের এই সংশযটুকু সে বাবার নিকট প্রকাশ করিল না, বরং উৎসাহের সহিত জানিতে চাহিল,—আচ্ছা, বাবা, সেথানকার ছেলে-গুলোকে ত আপনি পরীক্ষা ক'রবেন?

সার কহিলেন,—করাই উচিত, কিন্তু তা ত পেরে উঠব না, বেবী, সময়ের অভাব; শুধু স্কুলটাই পরীক্ষা ক'রব।

বেবী এবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল,—বা-রে! তা' বুঝি হয়? স্কুলের ছেলেগুলোকে আগে পরীক্ষা না ক'রলে কি ক'রে স্কুলটার পরীক্ষা হবে, বাবা। স্কুলের বাড়ীখানা ত, আর পরীক্ষা দেবে না।

উচ্চহাস্য করিযা সার কহিলেন, সত্যিই তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ, বেবী! এ কথাটা আমি তলিয়ে ভাবিনি।

বেবীর মনটি যেন প্রসন্ন হইল, সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি কৌতুকোজ্জ্বল করিয়া সে কহিল,—একটা কায কেন করুন না, বাবা! তাতে সব দিক্ বজায় থাকে; স্কুলটাও দেখা হয়, সেথানকার ছেলেগুলো কেমন বোঝা যায়, অথচ আপনারও নাম হয়।

সার তাঁহার দৃষ্টিতে যেন প্রশ্ন লইয়া বেবীর দিকে চাহিলেন। বেবী হাসিমুখে ধীরে ধীরে কহিল,—"আমি বলছিলুম কি,—সে দিন পণ্ডিত মশায় একটা রচনা আমাকে লিখতে দেন; তার বিষয়টা হ'চ্ছে—'দুরাত্মার ছলের অভাব হয়না!' খুব সংক্ষেপে নিজের কথায় ঐ বিষয় নিয়ে একটা গল্প লিখতে তিনি বলেন।"

সার কহিলেন,—"মনে পড়েছে। পণ্ডিতমশাই তোমার সে রচনাটা আমাকে দেখিয়ে খুব প্রশংসাই ক'রেছিলেন; আমিও পড়েছি। তুমি চমৎকার লিখেছিলে বেবী।"

বেবী এবার উৎসাহের সুরে কহিল,—"সে রচনাটা আপনি কেন স্কুলের ছেলেদের দিননা, বাবা? সেখানে গিয়েই এই রচনাটা তাদের লিখতে ব'লবেন। তারা লিখতে থাকবে, আপনিও স্কুল দেখবেন। ব'লে দেবেন, যার রচনা ভাল হবে, তাকে একটা ভাল প্রাইজ দেবেন, ভাল ভাল বই নগদ টাকা কিম্বা একটা স্কলারসিপ। তাতে আপনারও নাম হবে, আর ছেলেগুলোরও উৎসাহ বাড়বে।"

বেবীর প্রস্তাব সারের অত্যন্ত মনঃপূত হইল, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে তিনি কহিলেন,—"বেশ, বেশ, বেশ; আমি খুব রাজী, বেবী। আমি এই ব্যবস্থাই ক'রব; আর এই রচনার খাতাগুলো তোমাকে দেব, বেবী; তুমিই পরীক্ষা ক'রবে।" উৎসাহের আনন্দে উদ্দীপ্ত মুখে বেবী কহিল,— "তা হ'লে যার রচনা সব চেয়ে ভাল হবে, তাকে যে প্রাইজ আমি দিতে ব'লবো, তাই কিন্তু আপনাকে দিতে হবে, বাবা।"

সার বেবীর কথায় সায় দিয়া কহিলেন,—"তাই হবে বেবী, আমি কথা দিচ্ছি। আমি ব'লব, প্রাইজ তুমি দিবে।"

কয়েক দিন পরে রেখা এক তাড়া কাগজ লইয়া তাহার বাবার সুসজ্জিত বসিবার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ হইতেই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সুযোগ মিলিতেছিলনা। সে ঘর যেন আর খালি হইতে চাহেনা, সর্ব্বদাই লোক যেন গিস্‌গিস্ করিতেছে; এক দল যায় ত, আর একদল আসে। এবার ঘরটি খালি হইতেই সে ছুটিয়া আসিয়াছিল, দ্বারের কাছে যে বেহারা দাঁড়াইয়াছিল ঘরে ঢুকিবার সময়

সে তাহাকে বলিয়া গেল, এখন আর কারুর স্লিপ সে যেন বাবার কাছে না আনে।

সার-ও তখন উঠি-উঠি করিতেছিলেন, কন্যাকে দেখিয়া হাসিমুখে কহিলেন,—"বেবী যে, কি খবর ?"

বেবী হাতের কাগজগুলা সারের টেবলের উপর রাখিয়া কহিল,—"রচনার কাগজগুলো সব দেখা হ'য়ে গেছে বাবা।"

সার কহিলেন,—"বল কি, এর মধ্যেই সব পড়ে ফেলেছ ?"

রেখা কহিল,—"হাঁ, বাবা পড়েছি ; আর পড়ে বুঝেছি, আপনি সে দিন এই ছেলেদের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা ঠিক নয়।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সার প্রশ্ন করিলেন,—"কেন বল ত।"

রেখা একটু হাসিয়া উত্তর দিল,—"গাধা এদের কাউকে বলা যায়না, বাবা! মানুষের মতনই লিখেছে, আর হাতের লেখাগুলো এদের কেমন পরিষ্কার ; দেখে আমারই হিংসা হয়।"

সার কহিলেন,—"বটে! তা হাতের লেখার ত প্রশংসা ক'রলে, 'এসের' কথা ত কিছু ব'ললেনা!"

রেখা কহিল,—"ভারি আশ্চর্য্য, বাবা। 'এসে' লিখতে ব'সে একজন ছাড়া আর সকলেই 'কথামালার' সেই নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবকের গল্পটি হুবহু 'কোট' ক'রেছে।"

সার কহিলেন,—"সেই গল্পটা বুঝি,—ঝরণার নীচে মেষশাবক জল খাচ্ছিল, উপর থেকে বাঘ তাকে ডেকে বলে—'জল ঘুলিয়ে দিলি কেন ?'

রেখা কহিল,—"হাঁ বাবা, সেই গল্প! যুক্তিতে না পেরে মিছে একটা ছুতো ধরে আর গায়ের শক্তিতে বাঘটা দুর্ব্বল মেষশিশুর ঘাড় ভেঙেছিল। এই গল্প থেকেই গ্রন্থকার ঐ কথাটা ব'লেছিলেন—'দুরাত্মার ছলের অভাব হয়না'।

সার কহিলেন,—“কিন্তু এই কথাটা নিয়ে তুমি ত একটা আলাদা গল্পই লিখেছিলে, বেবী! সেটি খাসা হ’য়েছিল।”

রেখা কহিল,—“এরাও এক একটি আলাদা আলাদা গল্প লিখবে, আমি ভেবেছিলুম। কিন্তু একটি ছেলে ছাড়া সবাই ‘কথামালার’ গল্পটিকে ‘ফলো’ ক’রেছে।”

সার প্রশ্ন করিলেন,—“আর যে ছেলেটি আলাদা গল্প লিখেছে, তার লেখাটি কি রকম হ’য়েছে, বেবী?”

রেখা মুখখানি সহসা গম্ভীর করিয়া কহিল,—“চমৎকার! আমার চেয়ে ঢের ভাল লিখেছে।”

সার সবিস্ময়ে কহিলেন,—“বল কি?”

রেখা কাগজের তাড়াটির উপর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা চিহ্নিত লেখাটি বাহির করিয়া কহিল,—“এই লেখাটি, বাবা। আমার লেখা ত আপনি পড়েছেন, এখন এই লেখাটা আমি পড়ছি, আপনি শুনুন; আপনাকেও ব’লতে হবে,—‘চমৎকার’।”

পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই রেখা তাহার হাতের ভাঁজ-করা কাগজখানি খুলিয়া রচনাটির পাঠ আরম্ভ করিয়া দিল।

গল্পটি পড়িতে দশটি মিনিটের অধিক সময় লাগিলনা। কিন্তু পড়া শেষ হইতেই রেখা তাহার আনন্দোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি পিতার মুখের দিকে তুলিতেই দেখিল, দশ মিনিটের মধ্যেই তাঁহার প্রসন্ন মুখখানি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে! কে বলিবে সে চক্ষু মানুষের! তাহার তারা দুইটি যেন জ্বলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখখানিও কি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে! রেখার মনে হইল, পিঁজরার বাঘকে সহসা খোঁচা দিয়া রাগাইলে তাহার চেহারা এমনই ভীষণ হইয়া উঠে!

পিতার মুখের দিকে রেখা আর চাহিয়া থাকিতে পারিলনা, তাহার চক্ষু দুইটি আপনা-আপনিই নত হইয়া পড়িল।

সার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ ছেলেটার নাম কি?"

রেখা হাতের কাগজখানায় লেখা নামটি না পড়িয়াই উত্তর দিল,—"অরুণকুমার রায়।"

কন্যার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সার কহিলেন,—"নামটা তোমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে দেখছি!"

রেখার মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল; সে বুঝিতে পারিলনা, সার এমন কঠোর স্বরে এ কথা কেন তাহাকে কহিলেন! এতগুলো রচনার মধ্যে একটি লেখাই তাহার ভাল লাগিয়াছে—এমন লেখা সে নিজেও লিখিতে পারে নাই; সুতরাং এমন রচনা যে লিখিতে পারে, তাহার নামটি ত মনে থাকিবারই কথা। না দেখিয়া নামটি বলিয়া সে কি অন্যায় করিয়াছে? কিন্তু এই ছেলেটির রচনা শুনিয়া সার এমন অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন কেন?

সার কন্যার চিন্তা-বিষণ্ণ মুখের দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বদ্ধ রাখিয়াই কহিলেন,—"বিষয়টা ডিক্‌টেট ক'রবার সময় আমি ছেলেদের ব'লেছিলুম, লেখার শেষে সকলেই নিজের নাম, বাপের নাম, জাত, বয়স, ক্লাস আর সাকিন লিখবে। এ ছেলেটা কি লিখেছে পড় ত।"

রেখা পড়িল,—"শ্রীঅরুণকুমার রায়, পিতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায়, জাতি ব্রাহ্মণ, বয়স ১৪ বৎসর ৮ মাস, সাকিম বিলাশপুর। প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।"

এই কয়টি ছত্র শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সারের মনে হইল, তিনি বুঝি অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন; মুখমণ্ডল অতি মাত্রায় বিকৃত

করিয়া তিনি সবেগে সোফা হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং টেবলের উপর সজোরে একটা ঘুসি মারিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "আশু রায়! চিনেছি; সেই স্কাউণ্ড্রেল! তারই ছেলে; ও! শিশু সয়তান! আমি একে রাষ্টিকেট করাব।"

কথাগুলি বলিয়াই সার একটা দমকা বাতাসের মতই বাহির হইয়া গেলেন। রেখা একাই ঘরে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, টেবলের উপর তাহার পিতা রাগের বশে যে ঘুসিটি মারিয়া গেলেন, তাহা অরুণকুমার রায়ের উপর না পড়িয়া তাহার মাথার উপরেই পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি গল্পটি শুনিয়াই হঠাৎ রাগিযা উঠিলেন কেন? তবে কি অরুণকুমার তাহার গল্পে যে ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার উপর কোন কটাক্ষ আছে? রেখার দুই চক্ষুর দৃষ্টি এবার যেন আর একদিক্ দিয়া খুলিয়া গেল, পুনরায় সে গল্পটি পড়িতে বসিল।

অরুণকুমার বিলাসপুর হাই স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। এই বিদ্যালয়ের প্রায় পৌনে চারিশত ছেলের মধ্যে আর্থিক অবস্থায় এই ছেলেটির স্থান যত নিম্নে থাকুক না কেন, সৎস্বভাব ও শিক্ষাগত প্রতিভা তাহাকে সকলের উপরে স্থান দিয়াছে। কিন্তু বাড়ীর নিত্য অভাব ও বহু অসুবিধার মধ্য দিয়াও সে কিরূপে যে এত উচ্চে উঠিতে পারিয়াছে, তাহার সন্ধান লইলে বিস্মিত হইতে হয়।

অরুণকুমারের বাবা আশুবাবু একটা বড় আফিসে চাকুরী করিতেন। যে মাহিয়ানা পাইতেন, সঞ্চয় করিতে না পারিলেও তাহাতে সংসার স্বচ্ছলভাবেই চলিতেছিল। হঠাৎ কালবৈশাখীর মেঘের মত একটা দুর্য্যোগ আসিয়া তাঁহার ভাগ্যের আকাশ ছাইয়া ফেলিল এবং এক দিনেই সব ওলট-পালট করিয়া দিল।

আশুবাবু আফিসের হিসাব রাখিতেন। সে দিন নিবিষ্ট মনে কায করিতেছেন, হঠাৎ ম্যানেজার "সাহেবের" ডাক পড়িল। ম্যানেজার বাঙ্গালী হইলেও চালচলনে য়ুরোপীযের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলেন; আফিসের চাকর বেহারা হইতে বাবুদিগকে পর্য্যন্ত ম্যানেজার বাবুকে "সাহেব" বলিতে হয়। কাহারও ভুল হইলে আর রক্ষা থাকে না।

আশুবাবু "সাহেবের" কক্ষে ঢুকিবামাত্রই "সাহেব" মুখখানা অতিশয় গম্ভীর করিযা তাঁহাকে কহিলেন,—"আপনাকে নিযে এ অফিসের কায আর চ'লছে না, তাই ডিসমিস করা হ'ল।"

আশুবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল! পঞ্চাশ টাকা বেতনের কেরাণী তিনি, ইহাই তাঁহার উপজীবিকা; এক পাল পোষ্য, কাচ্চা-বাচ্ছা অনেকগুলি! এই বয়সে চাকরী গেলে তাহাদিগকে খাওয়াইবেন কি?

মুখখানি ম্লান করিযা আশু বাবু কহিলেন,—"আমার কাযে কি কোন গলদ হ'যেছে, সার?"

'সাহেব' কহিলেন,—"নিশ্চয়ই; তা না হ'লে ডিসমিস ক'রব কেন?"

আশুবাবু কহিলেন,—"পনের বছর ধরে এ আফিসে আমি কায ক'রছি সার, লেজারের খাতা আমারই হাতের লেখা; একটি হরফও তাতে কাটাকুটি নেই; কোন বারই 'অডিটে' একটি ভুলও ধরা পড়েনি।"

'সাহেব' কহিলেন,—"কিন্তু আপনার ফাঁকিবাজী ধরা পড়েছে। আপনি প্রত্যহই দেরী ক'রে আসেন, আর সকাল সকাল পালান।"

আশুবাবু ধীরকণ্ঠেই কহিলেন,—"এ কথার প্রতিবাদে কি ব'লব, সার? আপনি য়্যাটেন্‌ডেন্স্ খাতাখানা আনিয়ে দেখতে পারেন, একটি দিনও আমার লেট্ নেই, আর পাঁচটার আগে কোন দিনই আমি আফিসের কায ফেলে পালাইনি।"

'সাহেব' কহিলেন—"আমি জেনেছি,'আফিসে যতক্ষণ আপনি থাকেন, তা'র অর্দ্ধেকটা টিফিন-ঘরে পান-তামাক নিয়েই কাটান।"

আশুবাবু সবিনয়ে উত্তর দিলেন,—"আমি যে পান-তামাক খাই না, আফিস শুদ্ধ এ কথা সবাই জানে, সার।"

'সাহেব' এবার সুর একটু চড়াইয়া কহিলেন,—"আপনার গাল-গল্পের জ্বালায় আফিসের আর সব বাবুদের কায করা দুরূহ হ'য়ে উঠেছে, এ 'কমপ্লেন্' সকলেই আমার কাছে ক'রেছে।"

আশুবাবু নম্রকণ্ঠে জানাইলেন,—কিন্তু আমার সিট্ ত একেবারে নিরালায় সার। সেখান থেকে কারও সঙ্গেই ত গল্প করা সম্ভব নয়!"

এই উত্তরে 'সাহেবকে' উদ্ধত করিয়া তুলিল, তিনি বজ্রকণ্ঠে কহিলেন, —"আপনি কি ব'লতে চান, আমি মিথ্যা ব'লছি?"

আশুবাবু যতদূর সম্ভব সংযত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন,—"কিন্তু আমার কথাগুলোর প্রত্যেকটি যে সত্য, আমি তা হলফ ক'রে বলতে পারি, সার! আমার সহকর্ম্মীরা সকলেই জানেন, আমি কখন মিথ্যা বলি না, কোন দিন বলি নি!"

এ কথার উত্তরে 'সাহেব' তর্জ্জনের সুরে কহিলেন,—"নিশ্চয় ব'লেছ, তার প্রমাণ আছে।"

বিস্ময়ের সুরে আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন,—"আমার বিরুদ্ধে?"

'সাহেব' কহিলেন,—"হাঁ, মনে পড়ছে না—কাউন্সিল্ ইলেক্সনের সময় তুমি দেশে যে কীর্ত্তি ক'রেছিলে, তোমার জমিদারকে ঠেলে ফেলে একটা হা-ঘরে চ্যাঙ্ড়া ছোঁড়াকে ভোট দিয়েছিলে—তা'র গায়ে কংগ্রেসের ছাপ ছিল ব'লে! ভেবেছিলে—ডুবে ডুবে জল খেয়েছ, শিবের বাবাও টের পাবে না; কিন্তু এ কথা চাপা থাকে না।"

আশুবাবুর কণ্ঠ কে যেন সবলে রুদ্ধ করিয়া দিল। কি কথা হইতে

কোন্ কথা আসিয়া পড়িল! কাউন্সিলের বিগত ভোটের সহিত এই আফিসে তাঁহার স্থিতি বিচ্যুতির কি সম্বন্ধ, বিস্ময়ে তিনি তাহা ভাবিতে লাগিলেন।

'সাহেব' বক্রদৃষ্টিতে আশুবাবুর বিমূঢ় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, এইবার ঠিক স্থানটিতেই আঘাত দিয়াছেন।

কিন্তু পরক্ষণেই 'সাহেবকে' চমকিত করিয়া আশুবাবু দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"আমার দেশের জমিদারকে আমি যদি ভোট না দিয়ে থাকি, তার সঙ্গে এ সব কথার কি সম্বন্ধ, সার?"

'সাহেব' মুখখানা অতিশয় গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—"সম্বন্ধ এই—তিনিই বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির 'পেট্রণ'।"

তৎক্ষণাৎ আশুবাবুর মনে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। তিনি বিদ্রূপের ভঙ্গীতে এবার কহিলেন,—"ধন্যবাদ সার,—গুডবাই! আর আমার কিছু ব'লবার নাই!"

কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তাঁহারই পুত্র অরুণকুমার অকুতোভয়ে এই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনীটিকেই "দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না" রচনাটির বিষয়বস্তু করিয়া লইবে, মর্ম্মাহত আশুবাবু সেদিন কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন কি?

'আরব্য-রজনীর' ধীবর তাহার জালে-পড়া কলসীর মুখ খুলিতেই একটা দৈত্যের অতিকায় মুখ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিল। আমাদিগের সারও যদি তাঁহার জমিদারীর স্কুলের একটা ছেলের রচনার ভিতর তাঁহার নিজের হিংসা-কদর্য্য মুখখানি দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ থাকিতে পারে কি?

পিতা যে সময় চাকরীটি হারাইলেন, অরুণ তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেছে। পড়াশুনা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তাহাকে কোন অসুবিধা ভোগ

করিতে হয় নাই, সে দুর্ভোগ এবার কঠোর হইয়াই দেখা দিল। স্কুলের আইন-কানুন ক্রমশঃই কড়া হইয়াছে; একটু এদিক্ ওদিক্ হইবার উপায় নাই। মাসের ঠিক পনেরো তারিখের মধ্যে মাহিনা না দিলেই, প্রতিদিন এক আনা হিসাবে জরিমানা দিতে হয়; শেষ দিনটি পার হইলেই নাম কাটা যায়। আবার তখন নূতন করিয়া—য়্যাডমিশন ফী জমা দিয়া নাম লিখাইবার কথা হয়। কিন্তু অরুণের বাবা তখন বেকার, আয় নাই, এক রকম পথে বসিয়াছেন বলিলেই হয়। এ অবস্থায় নিয়মিত সময়ে স্কুলের বেতন আড়াইটি টাকা দেওয়াও যে তাঁহাদিগের পক্ষে কত কষ্টকর, তাহা সে ভালভাবেই উপলব্ধি করিতেছিল। আবার এমনই বিধাতার খেলা, এই প্রকৃতির ছেলেদের আত্মসম্ভ্রমও অতিশয় প্রখর হইয়া থাকে! ভুল-চুক হইলে বা একটু অনবধানতার ফেরে কত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেও হাসি মুখে স্কুলের "ফাইন" দেয়; কিন্তু অরুণের মন ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, সে ভাবে ইহা একটা গুরু অপরাধ। দোষ করিলে ইংরেজের আদালতে দোষীরা জেল খাটে, বেত খায়, জরিমানা দেয়, স্কুলটাও ত তাহাই, এখানেও ত দোষীদিগের ঠিক ঐ রকমই শাস্তির ব্যবস্থা আছে; একবার যাহার শাস্তি হয়, চিরদিনের মত সে দাগী হইয়া থাকিবে। অরুণ মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করে,—দোষ সে কোন দিনই করিবে না, বরাবরই ভাল ছেলে হইয়া স্কুলে থাকিবে।

কিন্তু মাসটি কাবার হইলেই তাহার বুকখানি দুরু দুরু করে; পড়ার উপর ইহাও একটা ভাবনা বুকটি জুড়িয়া বসে,—কিরূপে আড়াইটি টাকা সংগৃহীত হইবে?

এই বয়সেই সঞ্চয়ের দিকে ছেলেটির কি যত্ন! কোন দিক্ হইতে যেদিন সংসারে কিছু সংস্থান হইত, তাহার ভিতর হইতেই জল-খাবারের জন্য কিছু অংশ অরুণ পাইয়াছে। কিন্তু তাহার একটি পয়সাও কোন দিন

কি সে টিফিনের সময় ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ব্যয় করিয়াছে?—তাহার পড়িবার ডেস্কটির ভিতর সেগুলি কি সন্তর্পণেই সে সঞ্চয় করিত—পনের তারিখের দায়টি মিটাইতে হইবে!

তথাপি সে ক্রমশঃই বুঝিতেছিল, এ দায় হইতে নিষ্কৃতির পথ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, মাহিয়ানার আড়াইটি টাকা মাস মাস নিয়মিতভাবে যোগান তাহাদিগের পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। অথচ সে পড়াশুনা ছাড়িতে পারে না। তাহা হইলে কেমন করিয়া মানুষ হইবে, কি করিয়া সে সংসারের কষ্ট ঘুচাইবে? না,—তাহাকে পড়িতেই হইবে এবং বাবার মনে ব্যথা না দিয়া নিজের চেষ্টাতেই সে পথ খুঁজিয়া বাহির করিবে।

একদিন টিফিনের ছুটির সময় বরাবর সে হেডমাষ্টার মহাশয়ের ছোট ঘরখানির ভিতর ঢুকিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

হেড মাষ্টার মহাশয় প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই সে অসঙ্কোচে অথচ সবিনয়ে কহিল,—"সার, আমি একটা কথা জানতে এসেছি।"

হেড মাষ্টার ছেলেটির সাহস দেখিয়া একটু বিস্মিতই হইয়াছিলেন। গম্ভীর মুখে কহিলেন,—"কি?"

অরুণ কহিল,—"এমন কোন উপায় কি নেই, মাইনে দেবার ক্ষমতা না থাকলে, বিনা মাইনেতেও যা'র জোরে ছাত্র পড়তে পারে?"

কঠিন প্রশ্ন,—বিশেষতঃ এই বয়সের ছেলের মুখে। হেড মাষ্টার ক্ষণকাল নিরুত্তরেই তাঁহার সম্মুখে নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান ছেলেটির প্রতিভাদৃপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর স্মিতহাস্যে কহিলেন,—"পারে; যদি সে পরীক্ষার সময় প্রত্যেক বিষয়েই ফার্ষ্ট হয়।"

হেড মাষ্টারের কথায় অরুণের মুখখানি যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, উৎসাহের সুরেই সে পুনরায় কহিল,—"আচ্ছা সার, হাফ-ইয়ারলী

একজামিনেসন ত এসে পড়েছে, ওতে যদি আমি সব বিষয়ে ফার্ষ্ট হ'তে পারি, তা হ'লে আসছে মাস থেকে কি আমি ফ্রী পড়তে পারব ?"

"তুমি কোন্ ক্লাসে পড় ?"

"ফিফ্থ্ ক্লাসে সার !"

"তোমার নাম ?"

"শ্রীঅরুণকুমার রায় ।"

"তুমি এ প্রশ্ন কেন ক'রছ ?"

"মাইনে দিয়ে পড়বার সামর্থ্য আমার নেই সার, তাই ।"

হেড মাষ্টার কহিলেন,—"বেশ ; পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে যদি তাতে তোমার ঐ যোগ্যতাই দেখা যায়, আমি কথা দিচ্ছি—তোমাকে আসছে মাস থেকেই ফ্রী ক'রে নেব ।"

পরীক্ষায় এই যোগ্যতার পরিপূর্ণ পরিচয় দিয়াই সে মাসে মাসে মাহিয়ানা দিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে এবং বৎসরের পর বৎসর ক্লাসপ্রমোসনের সময় সকল ছেলের উপরে নিজের স্থানটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এ পর্য্যন্ত সে এই সুবিধাই ভোগ করিয়া আসিতেছে ।

কিন্তু মাহিয়ানা দিবার ভাবনা সে কাটাইতে পারিয়াছে, সংসারের ভাবনা ত সে কিছুতেই এড়াইতে পারে নাই। পড়ার বই খুলিয়া বসিলেই, প্রতি অক্ষরটির মধ্য দিয়া অভাব যেন ফুটিয়া উঠে! বাবার অসহায় অবস্থা, মা'র বিষণ্ণ মুখ, ছোট ছোট ভাইবোনগুলির দুর্ব্বার ক্ষুধা তাহার অন্তরে যেন অগ্নি জ্বালিয়া দেয়। অথচ তাহার বেদনা অকাতরে সহ্য করিয়া পড়াও তাহাকে সারিতে হইবে, শ্রেণীর যে স্থানটি এ পর্য্যন্ত সে দখল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হারাইলে স্কুলের দ্বার তাহার পক্ষে বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু নিজের পড়া সারিয়াও বাবার এই

অসময়ে সে কি কিছুই সাহায্য করিতে পারে না। মায়ের হাতে, অত্যন্ত অভাবের সময় যদি সে কিছু আনিয়া দিতে পারে—কি আনন্দই হয়! কিন্তু এই বয়সে তাহার পক্ষে কি ভাবে পয়সা উপায় করা সম্ভব?

অর্থ উপার্জ্জনের সম্ভাবনা অরুণের চক্ষুর উপরেই এক দিন যেন সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। স্কুলবাড়ীর আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন হওয়ায় ইমারতের কায আরম্ভ হইয়াছিল। অরুণ দেখিল, তাহার অপেক্ষাও অল্প বয়সের ছেলেরা ইটের ঝুড়ি মাথায় করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঢালিয়া দিতেছে। অরুণ একটি ছেলেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এ কাযে কি রকম রোজগার কর, ভাই?"

মজুর-ছেলেটি কহিল,—"ফুরণে কায করি, একশ ইট এখান থেকে ব'য়ে ঐখানে পৌঁছে দিলে চার পয়সা পাই।"

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল,—"কতগুলো ইট তুমি রোজ নিযে যাও।"

ছেলেটি উত্তর দিল,—"হাজারের বেশী পারি না, এক এক দিন হয় ত এক আধশ কমই হয়।"

উৎসাহ অরুণের মনে একটা নূতন প্রেরণা দিল। স্কুলের ছুটীর পর সে বাড়ী ফিরিতেছিল, বাড়ীর দিকে না যাইয়া সে পুনরায় স্কুলের ভিতরেই ঢুকিল। হেড মাষ্টার তখনও তাঁহার খাস-কামরাটির ভিতরে ছিলেন। ইমারতের কায-কর্ম্মের হিসাব তাঁহাকেই রাখিতে হইত এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানেই এই কাযটি চলিতেছিল।

অরুণ পরদা ঠেলিয়া তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিয়াই, সসম্ভ্রমে কহিল, —"সার! আমার একটা প্রার্থনা আছে।"

হিসাবের খাতা হইতে চক্ষু দুইটি তুলিয়া হেড মাষ্টার অরুণের দিকে চাহিলেন। এখন আর অরুণ তাঁহার অপরিচিত নহে, সে সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র, এ ক্লাসে হেড মাষ্টার ইংরেজী সাহিত্য পড়াইয়া থাকেন এবং

এই ছেলেটির প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন। আজ অসময়ে স্কুলের এই সেরা ছেলেটিকে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিয়া ও তাহার মুখের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি প্রসন্নভাবেই কহিলেন,—"কি ? বল।"

অরুণ অকুণ্ঠিতভাবেই কহিল,—"সার, আমি জেনেছি, ছেলেমজুররা একশ ক'রে ইট ভিতের কাছে পৌছে দিলে এক আনা ক'রে মজুরী পায়। আমি যখন এই স্কুলেরই ছেলে, আমি চাইলে ত ও কায পেতে পারি ?"

হেড মাষ্টার মহাশয় সেকেণ্ড ক্লাসের এই সুন্দর ছেলেটির প্রার্থনা শুনিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলেন। ভদ্রঘরের কোন ছেলের মুখে এই ধরণের কথা তাঁহার কর্ণে কোন দিন প্রবেশ করে নাই। বিস্ময়ের ভাবটুকু কাটিতেই তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"বল কি ? ক্লাসের পড়া ছেড়ে তুমি টুক্‌রি মাথায় ক'রে ইট বইবে ?"

অরুণ কহিল,—"ক্লাস ছেড়ে ত কায ক'রবার কথা আমি বলিনি, সার! ওরা ত ফুরণে কায করে, আমিও তাই ক'রব। টিফিনের সময় আর স্কুলের ছুটীর পর আমি এ কায করব।"

অপলকনয়নে হেড মাষ্টার মহাশয় এই দুর্জ্জয় দৃঢ়তাসম্পন্ন ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহার বংশ-পরিচয় ইনি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। এই অদ্ভুত ছেলেটির পিতার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সকল তথ্য ও দুর্দ্দিনের ইতিবৃত্ত ইনি রুদ্ধ নিশ্বাসেই একদিন শুনিয়াছিলেন। আজ তাহার এই মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা অতীতের সকল কথাই তাঁহার কোমল চিত্তের উপর যেন একটি একটি করিয়া গভীর রেখা টানিয়া দিল,—সঙ্গে সঙ্গে কত বেদনাময় স্মৃতিই তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল,—অভাবের কি দুর্ব্বিষহ বেদনা, প্রয়োজনের কি নির্ম্মম তাগিদ এই ছেলেটির দেহ-মন আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহার জন্ত সে ছুটিয়া আসিয়াছে ক্ষিপ্তের মত ভদ্রসমাজের একান্ত অবাঞ্ছিত এই চরম উপায়টি অবলম্বন করিতে!

হেড মাষ্টারের চক্ষুর পল্লবগুলি সিক্ত হইয়া উঠিল, আর্দ্রকণ্ঠে তিনি কহিলেন,—"শোন অরুণ, তোমার এ প্রার্থনা আমি রক্ষা ক'রতে অক্ষম; তোমাকে আমি মুটে-মজুরের কায দিতে পারি না, তাতে এই স্কুলের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে। হাঁ, তবে তোমার যোগ্য অন্য কোন কায আমি তোমাকে দু'একদিনের মধ্যেই যোগাড় ক'রে দেব—এ প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিচ্ছি; তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

পরদিন হেড মাষ্টার মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া একটা কাযের ভার দিলেন। কাযটি কঠিন নহে এবং অরুণেরই যোগ্য। হেড মাষ্টারের পরিচিত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিবারে ছোট ছোট দুইটি ছেলেকে বর্ণপরিচয় ও ধারাপাত পড়াইতে হইবে। ইহার পারিশ্রমিক সে প্রতি মাসে পাঁচ টাকা পাইবে।

এই পাঁচটি টাকা গত কয় বৎসর ধরিয়া অরুণদের অচল সংসারটির চাকায় কত শক্তিই দিয়াছে!

এত অভাবের মধ্যেও অরুণ ভাবিতে ভুলে না, তাহাদের এই দুর্গতির মূল কে। বাবার মুখে সে সকল কথাই শুনিয়াছিল। অরুণ নিয়মিত ভাবে খবরের কাগজ পড়িত, দেশের ও দশের অভাব-দুর্দ্দশা বুঝিবার চেষ্টা করিত। যে জমিদার জমিদারীর ছায়াও কোনও দিন মাড়ান নাই, প্রজার অভাব-অসুবিধায় কখন দৃক্পাত করেন নাই, ইলেক্‌সনের সময় সেই জমিদারের পক্ষ তাহার বাবা যদি সমর্থন না করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে দোষী করিবার কি আছে? তাহার বাবা কর্ত্তব্যের অনুরোধে সত্যকেই আশ্রয় করিয়াছেন, ইহাঁতে তাঁহার গৌরবই বাড়িয়াছে; তবুও তিনি দারিদ্র্যকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু ইহাই ত তাঁহার মহত্ত্ব, ইহাতে দুঃখ করিবার কি আছে?

কিন্তু যে লোকটির পক্ষ তিনি সমর্থন করেন নাই, সেই লোক আজ

টাকার জোরে নির্ব্বাচিত হইয়াও দেশের কি উপকার করিতেছেন? কাগজ খুলিলেই ত তাঁহার সম্বন্ধে কত নিন্দার কথা পড়া যায়, দেশময় ত তাঁহার অপযশই রটিয়াছে!

সে দিন সেই লোকই তাহাদিগের স্কুল পরিদর্শন করিতে উপস্থিত। দেশের সংবাদপত্রগুলিতে তাঁহার নিন্দা ধরে না, তাঁহারই বিপুল সম্বর্দ্ধনায় এই স্কুলটির পরিচালকদিগের আগ্রহ, কি প্রচণ্ড উৎসাহ!

অরুণের কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই লোকটিই আজ তাহার পিতার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, দেশবাসীর স্বার্থেও ক্রমাগত আঘাত করিয়া চলিয়াছে।

ইহার পর অরুণের একান্ত অবাঞ্ছিত এই লোকটি যখন স্কুলের সব ছেলেকে ডাকিয়া রচনা-প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিলেন, বিষয়বস্তু বলিয়া লিখিবার নির্দ্দেশ দিলেন, তখন অরুণকুমারের পৃষ্ঠে কে যেন চাবুকের একটা আঘাত করিল, রচনার বিষয়টা—"দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না!" তৎক্ষণাৎ একটা অতি পরিচিত প্রেরণা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

সারের দুর্জ্জয় জিদ এবার কিন্তু দৃঢ় হইতে পারে নাই। তাঁহার আদরের বেবী তাঁহাকে ধরিয়া অতীতের সেই অপ্রিয় কথা শুনিয়া, শেষে একেবারে বুঝাইয়া জল করিয়া দিয়াছিল। সার ভাবিয়া পাইলেন না, তাঁহার কোপে পড়িলে যখন কেহই পরিত্রাণ পায় না, তখন বেবীর কথায় কিরূপে তিনি স্কুলের ঐ ছেলেটাকে ক্ষমা করিলেন; শুধু ক্ষমা কেন, বেবীকে দিয়া পঞ্চাশটি টাকা পুরস্কার বলিয়া মনিঅর্ডার করিবার হুকুম দিলেন! অথচ এই ছেলেটারই বাবা, একদিন তাঁহার বিরুদ্ধে গিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহাকে কি নাস্তানাবুদই না করিয়াছিলেন!

ছেলেটা যে গল্পটা লিখিয়াছে, তাহাতে তাহাকে রাষ্টিকেট করাই উচিত ছিল। কিন্তু বেবী এমনই কান্না যুড়িয়া দিল যে, তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। সে তাঁহাকে বুঝাইতে চাহিল,—"আপনি রচনার ভাল-মন্দ বিচার ক'রে তার গুণের কেন পুরস্কার দিন না? নিজেকে কেন ওর ভিতরে নিয়ে গিয়ে নিজেকেই ছোট ক'রছেন?"

বেবীর এ যুক্তি তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই, তাহার কথাই মানিয়া লইয়াছেন। নিজের অসীম মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য তাঁহার নিন্দুককেই পঞ্চাশটি টাকা পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই নির্ভীক ছেলেটিকে সর্ব্বান্তঃকরণে তিনি মার্জ্জনা করিতে পারিয়াছেন কি?

ড্রয়িংরুমে সে দিন সার একাই বসিয়া ছিলেন; এমন সময় বিষাদ-প্রতিমার মত রেখা সেখানে প্রবেশ করিল; তাহার হাতে একখানা খোলা চিঠি।

কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া সার শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার একি চেহারা হইয়াছে! সদাপ্রফুল্ল মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে, তুই চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার কোণে সঞ্চিত অশ্রু যেন টল টল করিতেছে! কন্যাকে সস্নেহে কোলের দিকে টানিয়া সার প্রশ্ন করিলেন,—"কি হ'য়েছে, বেবী?"

বেবী নিরুত্তরে খোলা চিঠিখানা হাতে দিল। রুদ্ধনিশ্বাসে তিনি তৎক্ষণাৎ চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

"মাননীয়াসু,

আপনার বিচারে আমার রচনাটি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করায় আপনি আমাকে ইহার পুরস্কার স্বরূপ পঞ্চাশটি টাকা পাঠাইয়াছেন। আপনার এই করুণা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, ইহা বুঝি রচনার বিষয়-বস্তুটির আর একটি নূতন অধ্যায়! সে যাহাই হউক, আপনার এই

কৃপার দান আমি ফেরৎ পাঠাইতে বাধ্য হইতেছি। কারণ, সংবাদপত্রে দেখিলাম, বিনাবিচারে বন্দী তরুণদিগের মুক্তি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব পরিষদে উঠিয়াছিল, আপনার পিতার অসীম সৌজন্যেই তাহা গৃহীত হইতে পারে নাই। এ অবস্থায় আপনার পৈতৃক অর্থ স্পর্শ করাও যে আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় নহে, আপনার ন্যায় মহীয়সী মহিলা তাহা, বোধ হয়, অস্বীকার করিবেন না। ইতি

বিনীত

শ্রীঅরুণকুমার রায়"

সারের হাত হইতে চিঠিখানা খসিয়া কার্পেটের উপর পড়িয়া গেল। বিভিন্ন সংবাদপত্রের শত শত কঠোর মন্তব্য যাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই, একটা স্কুলের ছেলের হাতের লেখা এই চিঠিখানার প্রতি ছত্র আজ তাঁহার চিত্তে চাঞ্চল্যের কি শিহরণই তুলিল!

রেখা পিতার মুখের দিকেই এতক্ষণ চাহিয়াছিল, আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে সে ডাকিল,—"বাবা!"

উচ্ছ্বসিত আবেগে কন্যাকে কাছে টানিয়া সার অশ্রুরুদ্ধস্বরে কহিলেন, —"আয়, মা!"

রেখা লক্ষ্য করিল, পিতার চক্ষুপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু, যাহা কোন দিন তাহার চক্ষুকে আকৃষ্ট করে নাই! আজ কি তবে পাষাণ বিগলিত হইল,—মরুর মাঝারে বহিল বারির ধারা?

সাবিত্রীর প্রায়শ্চিত্ত

এক

যে মেয়েটিকে লইয়া আমাদের এই গল্প, তাহার নাম সাবিত্রী। সাবিত্রী সুন্দরী, বয়স হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। পল্লীর মহিলা-মজলিসে সাবিত্রীর প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য প্রায়ই উঠিয়া থাকে,—'রূপ-গুণ থাকলে কি হবে, বাপের যে পয়সা নেই ; তাই বর জুটছে না! কথায় আছে না—অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, অতি বড় রূপসী না পায় বর ; এরও হয়েছে তাই। বরাত বরাত!'

সাবিত্রীর বাবা সদয় ঘোষাল ছাপোষা মানুষ ; অনেকগুলি কাচ্চা বাচ্চা ; সম্বল সত্তর টাকা মাহিনার এক চাকরী এবং শিবপুর সহরে কাঠা তিনেক জমির উপর একখানা সেকেলে ধরণের একতলা বাড়ী। ইহাই বাঁধা রাখিয়া সাবিত্রীকে পার করিতে কি চেষ্টাই না তিনি করিতেছেন! কিন্তু একটু পছন্দমত ছেলের দর কিছুতেই তিনটি হাজারের নীচে বহু সাধ্য-সাধনা করিয়াও নামাইতে পারেন নাই। কাযেই তাঁহাকে হাল ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে ; যেহেতু, বাড়ীখানা বাঁধা রাখিয়া তিন হাজার টাকা কিছুতেই পাওয়া যাইতে পারে না, একেবারে বিক্রমপুরে পাঠাইলে হয় ত টাকাটা উঠিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে সপরিবার রাস্তায় দাঁড়াইতে হয়।

সদয় ঘোষালের অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া থাকে শ্রীমান্ অমিয় রায়। এই সুবৃহৎ পল্লীটির আর একটি প্রান্তে যদিও তাহার বাড়ী, কিন্তু এই বাড়ীর বাহিরের ঘরখানিতে একটিবার না বসিলে তাহার দিন চলে না। ছেলেটির অবস্থা ভালই, বেশ দুপয়সা উপায় করে ; তরুণ বয়স, সুশ্রী, সুন্দর চেহারা, এ বাড়ীর সকলেই তাহাকে ভালবাসে, বালক-বালিকারা

তাহাকে অমিয়-দা বলিয়া ডাকে। অমিয় পাড়ার তরুণদলের নেতা, ক্লাব, লাইব্রেরী, সভা-সমিতির মাথা। সুতরাং অমিয়র মত প্রিয়দর্শন জনপ্রিয় তরুণের উদ্দেশে তরুণী সাবিত্রীর মাথাটি শ্রদ্ধায় নত হইবারই কথা।

ইহার মধ্যে বাধ্যবাধকতার একটা বন্ধনও অপ্রত্যাশিতভাবে পড়িয়াছিল। বয়স বাড়িলে সাবিত্রীকে বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব কাটাইতে হয়, কিন্তু পাঠের স্পৃহাটা সংস্কারের মতই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে। ইহাতে উত্তরসাধক হইয়াছিল অমিয়। লাইব্রেরী তাহার হাতে, সকল বইয়ের হিসাব সে রাখিত; কোন্ বই ভাল, অবাধে মেয়েদের হাতে দেওয়া চলে, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে, জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে, তাহার সন্ধান সে রাখিত। সুতরাং সাবিত্রীর বিদ্যার দৌড় হাইস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে বাধা পাইলেও, সেখান হইতে ফিরিয়া বিদ্যাচর্চ্চাকে সে একেবারে বিদায় দিতে পারে নাই, কেতাব পড়িয়া অনেক কিছুই শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

সাবিত্রী যখন বই শ্লেট লইয়া বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচারিকার সহিত পড়িতে যাইত, তখন অমিয়র সহিত অবাধে মিশিয়াছে, খেলা-ধূলা করিয়াছে, কত গল্পগুজব তাহাদের মধ্যে চলিযাছে। সে সময় সাবিত্রী বালিকা, অমিয় কলেজের পড়ুয়া।

স্কুল ছাড়িয়া সাবিত্রী অমিয়র ছাত্রী হইলে, কিছুকাল বাহিরের ছোট ঘরখানিতেই তাহাদের পড়াশুনা চলিত। কিন্তু যেদিন সদয় বাবু মেয়েকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন,—বয়েস হয়েছে তোমার, এ ভাবে মেলামেশা ত আর ভাল দেখায় না, মা! সেইদিন হইতেই সাবিত্রী আর অমিয়র সম্মুখে বাহির হইত না। অমিয় আসিলেই সে ভিতরের দিকের দরজাটির অন্তরালে আশ্রয় লইত।

অমিয় ছেলেটি বুদ্ধিমান্, অবস্থাটা সহজেই বুঝিয়া লইল এবং নিজেও সতর্ক হইল। সদয় বাবু হাসিমুখেই অমিয়কে বলিয়া দিলেন—এ তোমার বাড়ী মনে ক'রে আসবে, অমিয়। ছেলেগুলোর পড়ার দিকে একটু নজর রেখো, আর সাবি আমার বইয়ের পোকা, তুমিই ওকে বিদ্বান্ করে তুলেছ, ওর পড়ার বই যুগিয়ে যেয়ো, বাবা! লাইব্রেরীর চাঁদাটা আমি ঠিক যোগান দেবো। তবে কি জানো, বয়েস হয়েছে, বাইরের ঘরে ব'সে পড়া-শোনাটা আর ভালো দেখায় না।

এই সময় হইতেই সাবিত্রীর বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছিল। কিন্তু পাত্র মিলিতেছিল না।

অমিয় মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছিল, সাবিত্রী এক দিন তাহারই ঘর আলো করিবে। অবশ্য তাহাকে বধূর মর্য্যাদা দিয়া বরণ করিয়া আনিতে যে অনেক বিঘ্ন, তাহাও সে জানিত। কিন্তু তথাপি সে হতাশ হয় নাই, এক একটি বিঘ্ন নিশ্চিহ্ন করিয়া সাবিত্রীকে পাইবার দিন বুঝি সে গণনা করিতেছিল।

অমিয় জানিত, সাবিত্রীর বাবা সদয় ঘোষাল ছাপোষা মানুষ, সওদাগরী আফিসে কায করিয়া যাহা আনেন, তাহাতে কষ্টেই সংসার চলে; সঞ্চয় কিছুই নাই। সাবিত্রী সুন্দরী হইলেও বিনা পয়সায় তাহাকে গ্রহণ করিয়া দায় উদ্ধার করিতে কোন হৃদয়বান্ই দেখা দিবে না। সুতরাং সে যদি হঠাৎ এই মহত্ত্ব দেখাইতে চায়, সকলেই অবাক্ হইয়া যাইবে। মনে মনে এই ধরণের একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এদিকে অমিয়র মা ভাবিতেছিলেন, ছেলের বিবাহ দিয়া সালঙ্কারা বধূর সহিত যে টাকাটা নগদ পাইবেন, তাহাতে ছাদের উপর একখানা ঘর তুলিবেন। অমিয়দের বাড়ীখানা একতালা, তিনখানা ঘর, টানা দালান,

বাহিরে বৈঠকখানা। অমিয়র মা'র একান্ত ইচ্ছা, সিঁড়ির পাশে একখানা ঘর তুলিয়া বাড়ীখানাকে দোতালার মর্য্যাদা দেন।

ছোট ভাই অমৃত হাবড়ার স্কুলে পড়ে। দাদার বিবাহের কথা উঠিলেই সে উৎসাহের সুরে বলিত,—আমার কিন্তু একখানা বাইসিকেল চাই; কত আর দাম, ফর্দ্দে ওটা লিখে দিয়ো, মা! না হয়, পণের দরুণ যে টাকা নগদ পাবে, তা থেকে কিনে দিয়ো।

বিবাহসূত্রে এইরূপ মনোবৃত্তি ইহাদের। বিবাহের উৎসবে কাম্য শুধু বধূ নহে, সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু। ইহা যে নানা সূত্রেই ইহারা দেখিতেছে। এই মনোবৃত্তি কি অমিয় উপেক্ষা করিতে পারিত—সাবিত্রীকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা যদি না তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিত?

অমিয় হিসাব করিয়া কায করিত। ছোট সংসারটি স্বচ্ছন্দভাবে চালাইয়াও সে কিছু টাকা জমাইয়াছিল। তাহার বিবাহ উপলক্ষ করিয়া মা ও ছোট ভাইয়ের আকাঙ্ক্ষা সে প্রায়ই শুনিত। হঠাৎ একদিন সেল হইতে একখানা বাইসিকল সে কিনিয়া ফেলিল। অমৃত সে দিন অবাক্ হইয়া দেখিল তাহার দাদা ট্রামে না আসিয়া বাইসিকেলে চড়িয়া উপস্থিত। আগ্রহের সুরে প্রশ্ন করিল,—দাদা, এটা কার?

অমিয় কহিল,—তোমার। তুমি চেয়েছিলে, তাই কিনে এনেছি।

অমৃতের মুখে হাসি ধরে না, ছুটিয়া মাকে ডাকিয়া এ শুভ সংবাদ দিল, হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া দাদার দেওয়া উপহারটি দেখাইল।

মা একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—এখন এ খরচ না করলেই হ'ত, আর দুদিন বাদে অমির বিয়েতেই এটা যখন পাওয়া যেত'।

পরদিন অমিয় মা'র নিকট প্রস্তাব করিল,—ওপরের ঘরখানা তোলবার ভারি তোমার ইচ্ছে, মা। একটা ভাল দিন দেখে এ মাসেই ওটা আরম্ভ ক'রব ভেবেছি।

মা সবিস্ময়ে কহিলেন,—টাকার কি হবে, বাবা! কম খরচ ত নয়, আমি ভেবেছিলুম—

মা কি ভাবিয়াছেন, অমিয়র তাহা অজ্ঞাত নয়, কথাটা চাপা দিবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি অমিয় কহিল,—টাকার জন্য আটকাবে না, মা! যেখানে কায ক'রছি, সেখান থেকেই ব্যবস্থা হবে।

শুভদিন দেখিয়া যে দিন গৃহপত্তন আরম্ভ হইল, সেই দিন অপরাহ্ণে আফিস হইতে ফিরিয়া অমিয় তাহার আসল উদ্দেশ্যটি মায়ের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

মা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন,—সাবিত্রী মেয়ে ত নিন্দের নয়, কিন্তু বাপ মিন্‌সে যে একেবারে নেহাত ছাপোষা!

অমিয় কহিল,—তাতে কি? আমাদের সম্বন্ধ মেয়েকে নিয়ে।

মা কহিলেন,—কিন্তু দেওয়া থোওয়া?—

অমিয় কহিল,—আমাদের কি অভাব, মা। নাই বা দিলে—

মা এবার অতি বিস্ময়ে কহিলেন,—ও মা, তুই ব'লছিস্ কি রে? দেবে না কিছু, তোকে তা হ'লে গুণ করেছে ওরা! তুই আর ওমুখো হ'স্ নি, অমি; ছি, ছি,—কি ঘেন্না!

মায়ের কথায় ব্যথা পাইয়া অমিয় কহিল,—এতে ঘেন্নার কি পেলে, মা?

মুখখানা বিকৃত করিয়া মা কহিলেন,—নয়? তুই কিচ্ছু না নিয়ে মেয়ে আনবি ঘরে? কেন, দেশে কি আর মেয়ে নেই? কত মেয়ের বাবা দেনা-পাওনার ফন্দি নিয়ে সাধাসাধি করছে—এ ঘরে মেয়ে দিতে, আর তুই চলেছিস্ ওপরপড়া হ'য়ে মেয়ে ভিক্ষে করতে?

অমিয় জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া কহিল,—তাই যদি হয় মা, তাতেই বা দোষ কি? সবাই যেখানে পাওনাদার হয়ে দেনা-পাওনার

ফর্দ্দ নিয়ে যায়, আমরা যদি তা না ক'রে, শুধু মেয়েটি ভিক্ষে করতে যাই, সেটা কি খারাপ হবে?

মা কথাটায় রীতিমত জোর দিয়া কহিলেন,—হবে না? গ্রাম-শুদ্ধু সবাই ছি ছি করবে তাতে; বলবে, লেকাপড়া শিখে, রোজগার করতে জেনেও তুই বয়ে গেছিস্। আর দশ জনের কাছে আমার কি মুখ দেখাবার যো থাকবে তখন?

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে অমিয় জিজ্ঞাসা করিল,—কেন, মা?

মা তাঁহার ম্লান মুখখানার এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া উত্তর দিলেন,—পাড়ার সবাই চোখ তুলে আমার পানে তাকিয়ে আছে, তোর বিয়ে দিয়ে আমি কি পাই, তাই দেখবার জন্য। আমার যে বড় সাধ রে, জাঁক ক'রে সবাইকে দেখাব—তোর বিয়েতে আমি যা পেয়েছি, এমনটি আর কেউ পায় নি। আমার এ সাধ তুই ভেঙ্গে দিতে চাস, অমি!

অমিয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা মুখখানি তুলিয়া কহিল,—আচ্ছা মা, আজ যদি তোমার একটি মেয়ে থাক্‌তো আর বিয়ের বয়সে এসে দাঁড়াতো, তাকে পার করতে কি করতে তুমি?

মা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটার উত্তর দিলেন,—আর দশজনে যা করছে, তাই করতে হ'ত আমাকে; উপযুক্ত ছেলে রয়েছিস্ তুই, মেয়ে আমার থাকলে তার বিয়ে আটকাতো নাকি? টাকা যেমন করেই হোক যোগাড় হয়ে যেতো, আর এ কাযে যোগাড় হয়ে যায়-ও। সদয় বাবুর ভাবনা কি, টাকা না থাকে, বাড়ী ত আছে!

ইহার পর অমিয়র মুখে আর কোনও উত্তর যোগাইল না, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে নিরুত্তরেই বাহিরে আসিল।

মা বুঝিলেন,—ঔষধ ধরিয়াছে; ছেলে কোনদিনই তাঁহার অবাধ্য হয় নাই, এক্ষেত্রেও হইবে না।

অমিয় ভাবিয়াছিল, মাকে রাজী করিতে পারিলেই, সে সদয় ঘোষালের সহিত দেখা করিয়া প্রস্তাবটা তুলিবে এবং সহসা সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিবে। কিন্তু এখন বুঝিল, বাহির হইতে যত পয়সাই সে উপরি উপায় করিয়া আনুক এবং বাড়ীর যত অভাবই মিটাইয়া ফেলুক, বিবাহ করিতে হইলে মেয়ের সহিত দেনা পাওনার লম্বা ফর্দ্দটির প্রত্যেক জিনিসটি মেয়ের বাপের নিকট হইতে আদায় করিয়া আনিতে না পারিলে তাহার মায়ের মন উঠিবেনা, বধূ এক্ষেত্রে যত গুণবতীই হউক, কিছুতেই আদর পাইবেনা ; বরং তাহাদের শান্তিময় সংসারটির মাঝখানে অশান্তির একটা ভয়াবহ খাদ রচিত হইবে।

অমিয় শিহরিয়া উঠিল। চিরদিনই সে আনন্দময়, শান্তির পক্ষপাতী। আজ মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরের এক মেয়েকে আনিয়া সংসারে বিপ্লব বাধাইবে? মায়ের স্বার্থপূর্ণ মনোবৃত্তি তাহার চিত্তে নিদারুণ আঘাত দিলেও সে তাহা সহ্য করিতে অভ্যস্ত ছিল। কিছুতেই সে মনকে বিদ্রোহী হইতে দিলনা, দৃঢ়তার সহিত কহিল,—মা! আমার সুখ, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা—সবার ওপরে তিনি। অথচ, সাবিত্রীর সুন্দর মুখখানির প্রভাব একেবারে কাটাইয়া ফেলাও তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছিল।

এখন কি করিয়া সে দুই দিক্ বজায় রাখিবে? মায়ের মন রাখিয়া সাবিত্রীকে পাইতে হইলে, সাবিত্রীর বাবাকে রাস্তায় দাঁড়াইতে হয় ; কিন্তু এমন দুষ্কর্ম্মের প্রবর্ত্তক অমিয় কিছুতেই হইতে পারেনা। পক্ষান্তরে, সাবিত্রী এ-বাড়ীতে খালি হাতে আসিলে তাহার মায়ের মন কি প্রফুল্ল হইবে? শুভকর্ম্মে মায়ের প্রসন্নতাই কি প্রথম কাম্য নহে? মায়ের চিত্তে ব্যথা দিয়া কিছুই সে করিতে পারেনা। এই দোটানার আবর্ত্তে পড়িয়া পাক খাইতে খাইতে নিষ্কৃতির একটা উপায় সহসা সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

দুই

সদয় ঘোষাল তাঁহার বাড়ীর বাহিরের ঘরখানির ভিতর ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছিলেন। তখনও রাত্রি নয়টা বাজে নাই, বালক-বালিকারা এইমাত্র রাত্রির পাঠ শেষ করিয়া ভিতরে গিয়াছে।

হঠাৎ দ্বারের দিকে দৃষ্টি পড়িতে সদয়বাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন,—কে ?

অভিবাদনের ভঙ্গীতে হাত দুইখানি যুক্ত করিয়া কপালে ঠেকাইয়া অমিয় কহিল,—আজ্ঞে, আমি—অমিয়।

সহর্ষে সদয় বাবু কহিলেন,···আরে এসো অমিয়, এসো, ভেতরে এসো, বোসো—

অমিয় ধীরে ধীরে ঘরখানির ভিতর প্রবেশ করিয়া একখানা লোহার চেয়ার টানিয়া বসিল। সদয় বাবুও সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অপর পার্শ্বে আস্তৃত তক্তপোষটির উপর বসিয়া প্রসন্নভাবে অমিয়র দিকে চাহিলেন।

এ ঘর অমিয়র অতি পরিচিত। তাহার লাইব্রেরীর পথেই সদয় বাবুর এই বাড়ী এবং প্রায় প্রত্যহই এই পথটি অতিক্রম করিবার সময় লাইব্রেরীর গ্রন্থ সম্পর্কে তাহাকে এ বাড়ীর পড়ুয়াদের খবর লইতে হয়। অমিয়-দা'র সাড়া পাইলেই সাত হইতে এগারো বারো বছরের চার পাঁচটি বালক-বালিকা বাহিরে ছুটিয়া আসে ও তাহাদের এই অতি প্রিয় দাদাটিকে অভ্যর্থনা করিয়া এই ঘরটির ভিতর আনিয়া বসায়। কত আলোচনাই তখন চলিতে থাকে। বিবিধ গ্রন্থ ও সেই সকল গ্রন্থের সমজদার পাঠিকা-টিকে লইয়া। অমিয় তাহার চেয়ারখানি ঘুরাইয়া এমনভাবে বসিত, যাহাতে ভিতরের দিকের দরজাটির ঈষদুন্মুক্ত ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়া

তাহাদের আলোচ্য তরুণীটির দুইটি আয়ত চক্ষুর কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিটুকুর মাধুর্য্য অন্যান্যের অলক্ষ্যে সহজেই উপভোগ করিতে পারা যায়।

এই ঘরে প্রবেশ করিলেই অমিয় নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিত যে, তাহার সাড়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের অপর প্রান্তে তাহার আকাঙ্খিত প্রাণীটির আবির্ভাব হইযাছে। কিন্তু আজ সে কোনরূপ সাড়া দিয়া আসে নাই, সদ্য উদ্ভাবিত উপাযটি সম্বন্ধে সদয় বাবুর সহিত আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই সে এমন অসময়ে এ বাড়ীতে সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়াছিল।

সদয় বাবু সহসা প্রশ্ন করিলেন,—চা খাবে, অমিয ? কথার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের দিকে হুকুমটা চালাইতে তিনি উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। অমিয় তাড়াতাড়ি কহিল,—না, না, এখন আর চা খাবোনা, আপনি ব্যস্ত হবেননা।

সদয় বাবু কহিলেন,—তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে অমিয়, যে কাযটা আমি হঠাৎ ক'রে ফেলেছি, তার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথা আছে।

অমিয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সদয় বাবুর দিকে চাহিল, তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইলনা।

সদয় বাবু বালিসের তলা হইতে একখানা 'দৈনিক বসুমতী' বাহির করিয়া অমিয়র দিকে আগাইয়া দিয়া কহিলেন,—লাল চিহ্ন দেওয়া বিজ্ঞাপনটা পড় তা হ'লেই কথাটা আমার বুঝতে পারবে।

কাগজখানা ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া লইয়া অমিয় চিহ্নিত অংশটুকু এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। সেই বিজ্ঞাপনটির বয়ান অবিকল এইরূপ—

সুশ্রী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ব্রাহ্মণ কন্যার জন্য হৃদয়বান্ পাত্র চাই। পাত্রীর পিতা বাৎস্য গোত্রীয় ভদ্র গৃহস্থ, বিত্তহীন। কন্যার বয়স সতেরো; সৎশিক্ষা পাইয়াছে, যে কোন সংসারের ভার লইয়া নিপুণভাবে চালাইবার যোগ্যতা আছে। পাল্টা গোত্রের যে সদ্ব্রাহ্মণ এই সর্ব্বগুণান্বিতা

কন্যাটিকে সালঙ্কারা করিতে অন্ততঃ হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন, কন্যার পিতা তাঁহাকেই কন্যাদান করিবেন। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। বক্স নং ১২৫, বসুমতী।

অমিয়কে স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সদয় ঘোষাল সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন,—পড়লে, অমিয় ?

অমিয় শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিল,—হুঁ।

সদয় ঘোষাল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—কেমন, এবার ঠিক উল্টো রাস্তা ধরেছি ত ?

অমিয় উত্তর দিল,—শুধু উল্টো নয়, নতুনও।

উৎসাহের সুরে সদয় ঘোষাল কহিলেন,—জানি, তুমি এতে খুসীই হবে। অনেক বই ঘাঁটাঘাঁটি কর, কত বড় বড় লিখিয়ের লেখা ত পড় ; বল দেখি, এমন আইডিয়া কোন অথারের মাথা থেকে বেরিয়েছে এ পর্য্যন্ত ?

অমিয় সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—সত্যই কি এই আপনার অভিপ্রায় ?

কণ্ঠস্বরে রীতিমত জোর দিয়া সদয় ঘোষাল কহিলেন,—নিশ্চয়। আমি খুব সিরিয়াস হ'য়েই তোমাকে এ কথা বলছি, অমিয়। এ ভিন্ন সাবিত্রীকে পার করবার অন্য রাস্তা নেই। আর এ-ও তুমি দেখে নিয়ো, এই রাস্তা ধরেই তাকে পার করতে পারা যাবে অতি শীঘ্রই।

অমিয়কে অন্যমনস্ক দেখা গেল ; সে স্থির করিতে পারিতেছিলনা, ইহার উত্তরে সে কি বলিবে! যে প্রস্তাবটি তাহার মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, যাহা উত্থাপিত করিতেই তাহার আজ এ-গৃহে আবির্ভাব, গৃহস্বামীর এ উক্তির পরও তাহার প্রকাশ কি শোভন হইবে ? অমিয় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব আনিয়াছিল যে, সদয় ঘোষালের

নিকট আজ সে সাবিত্রীকে প্রার্থনা করিবে। সাবিত্রীর পাণি ভিন্ন অন্য কোন দাবী তাহার নাই। কিন্তু সদয় ও অমিয় ভিন্ন অন্য সকলেই জানিবে, কন্যার বিবাহে যথাসম্ভব পণ তিনি দিতেছেন। সেই পণের টাকা অমিয়ই তাঁহাকে গোপনে সরবরাহ করিবে।

কিন্তু নিজের প্রস্তাবটি তুলিবার পূর্ব্বেই, অমিয় সাবিত্রীকে পার করিবার যে ব্যবস্থা গৃহস্বামীর নিকট শুনিল, তাহাতে নিজের প্রস্তাবটি তোলা সে আর সমীচীন মনে করিল না।

অমিয়কে নিরুত্তর দেখিয়া সদয় বাবু কহিলেন,—খুব ঘা খেয়েই আমাকে এই রাস্তা ধরতে হয়েছে, অমিয়। সেই আরব্য উপন্যাসে একটা গল্প আছে না,—যাদুকর যখন দৈত্যটাকে মন্ত্রের জোরে কলসীর ভিতর পূরে জলে ফেলে দেয়, দৈত্য তাতে প্রথম প্রথম ভেবেছিল, যে তাকে উদ্ধার করবে, সে তাকে রাজা ক'রে দেবে। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেল', কেউ যখন তুললে না, সে তখন হতাশ হ'য়ে বলেছিল—এবার কেউ আমাকে উদ্ধার করলেই তার ঘাড় ভাঙ্গবো।—আমার অবস্থাটাও শেষে ঐ দৈত্যের মতই হ'য়ে দাঁড়াচ্ছিল।

অমিয় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সদয় ঘোষালের দিকে চাহিয়া রহিল।

সদয় ঘোষাল গলার স্বর কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া কহিলেন,—আমার পয়সা না থাকলেও এ জ্ঞানটুকু খুব টন্‌টনেই ছিল যে, মেয়ে যতই গুণের হোক, তাকে পার করতে পয়সার দরকার; যত সরেস ঘি হোক না কেন, সোজা আঙুলে ওঠে না। তাই, মনে মনে ভেবে রেখেছিলুম, যে যাই বলুক, বাড়ীখানা রেহান রেখে অন্ততঃ গা সাজিয়েও মেয়েটাকে দান করবো; নগদ, দানসামগ্রী, নমস্কারী এ সবও কিছু কিছু দেব। হাজার টাকার সংস্থান আমি করতুমই। শেষ এমনও ঠিক করেছিলুম, হাজার টাকায় যে ছেলে রাজী হবে, আমি দেড় হাজার তার জন্য খরচ করবো,

বাড়ী বেচতে হয়, আফিসে মাইনে বাঁধা রেখে ধার করতে হয়, তাও স্বীকার। কিন্তু, তুমি ত জানো, অমিয়, এমন একটি সম্বন্ধ এলো না— ফর্দ্দ যার তিন হাজারের নীচে। অথচ, আমাব সাবির মত মেয়ে আমাদের সমাজে ক'টা আছে? রূপে বল, গুণে বল, আক্কেল বিবেচনা বল, কিসে সে কম? একে পাওয়াটাই কি মস্ত লাভ নয? এব সঙ্গে ঘুষ দিতে হবে তিনটি হাজার? তাব পরই মাথায় এলো ঐ বুদ্ধি; ধরলুম ঠিক উল্টো রাস্তা। এখন আমার কথা—ফেল কড়ি, মাখো তেল; একটি পয়সা আর সাবিকে পার করতে খরচ কবছি না—বুঝেছ? এই যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, এব খরচা পর্য্যন্ত উসুল ক'রে নেব ঐ থেকে।

অমিয় স্থির হইয়া এই মর্ম্মাহত মানুষটির মর্ম্মবাণী শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বক্তার প্রত্যেক কথাটি তাঁহার ব্যথাহত কণ্ঠ ভেদ করিয়া তাহাবও বুকের উপব যেন হাতুড়ীর আঘাত দিতেছে! অভিভূতের মতই বুঝি নিজের অজ্ঞাতে সে-ও সহসা বলিয়া ফেলিল— আপনি ঠিক রাস্তাই ধরেছেন!

কিন্তু ইহার পর সে দিন তাহাদের আলাপ আর জমিল না; অমিয তাহার প্রস্তাবটা মনের ভিতরে মুলতুবি রাখিয়া উঠিয়া পড়িতেই সদয বাবু সহাস্যে তাহাকে কহিলেন,—দিন চারেক পরে একবার দেখা ক'র, অমিয়। নতুন রাস্তাটা ধরে হোঁচট খেলুম, কিম্বা কোনো হদিস্ পেলুম, সেটাও তোমার জানা দরকার।

তিন

অমিয় মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছিল, সাত মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না। সদয় ঘোষালের বিজ্ঞাপন পড়িয়া কেহই টাকার থলি লইয়া বধূবরণ করিতে দেখা দিবে না। বিবাহের বাজারে মেয়ের রূপ বা গুণ শুধু বিচার্য্য নহে, পণই এখানে প্রাধান্য পাইয়াছে। পাত্রপক্ষ এ সম্বন্ধে কিরূপ সতর্ক ও সচেতন, নিজের মায়ের মতবাদ হইতেই সে ত তাহা উপলব্ধি করিয়াছে। এ বাজারে মেয়ের রূপ ও গুণের খ্যাতি শুনিয়া পাত্রপক্ষ ঘর হইতে টাকা বাহির করিয়া পাত্রীর মর্য্যাদা দিবে! দুরাশা!

মনে মনে অমিয় ভাবিল, ভালই হইয়াছে; ঘোষাল যখন হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবে, তখন সে নিজেই তাল ঠুকিয়া আদর্শ হইয়া বাহবা লইবে। এ সম্বন্ধে সে এক উপায়ও ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল।

যে প্রতিষ্ঠানে অমিয় কায করিত, সেটি এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান, তাহার মালিকের নাম পতিতপাবন চৌধুরী। অমিয় সাহস করিয়া সকল কথাই ইহাকে খুলিয়া বলিয়া ইহারই সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিল।

কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহারা দুঃসাহসের পথে নামিয়া একটা নূতন কিছু করিতে চাহিত, চৌধুরী মহাশয় তাহাকে উৎসাহ দিতেন, সহায়তা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

অমিয়কে জেরা করিয়া সেই সূত্রে একটি একটি করিয়া সকল কথা জানিয়া লইয়া তিনি আশ্বাস দিয়াছিলেন,—আচ্ছা, তুমি প্রস্তুত হ'তে পারো, অমিয়।

সুতরাং অমিয় প্রস্তুত হইয়াই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল।

কয়দিন সে পাশ কাটাইয়া চলিল ; অন্য রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া লাইব্রেরীতে যাতায়াত করিল। এজন্য তাহাকে মনের সহিত কিরূপ' যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, তাহা সে নিজেই জানে। বিদ্রোহী মনটিকে সে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলেও বাধ্য করিতে পারিয়াছে কি ?

চতুর্থ দিনে সুধা আসিয়া উপস্থিত। অমিয় তখন তাহার চেয়ারটিতে বসিয়া লাইব্রেরীর কায করিতেছিল। সুধা দুইখানা বই ফেরত দিয়া কহিল,—ব্যাপার কি, অমিয়-দা, ক'দিন যান নি কেন ?

সুধাকে দেখিয়াই অমিয়র মনটি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে জোর করিয়া মুখে গাম্ভীর্য্য আনিয়া কহিল,—তোমরাও ত আমার খবর নাও নি।

সুধা দুই চক্ষু বিস্ফারিত কবিয়া কহিল,—বা রে! আপনার খবর ত রোজই পাই ; লাইব্রেরীতে আসেন, যান ; পাড়ার সকলে বই নিয়ে যায়। ক'দিন গেলেন না দেখেই না ছুটে এসেছি। দিদি বললে, আপনি পথ ভুলে গেছেন।

অমিয় কহিল,—তাই বুঝি আমাকে পথ চেনাতে আজ এসে পড়েছ ?

সুধা উৎসাহের সুরে কহিল,—তাই ত! আপনাকে আজ ধরে নিয়ে যাবো। জানেন, কদিন দিদির বই পড়া হয়নি, আমরাও গল্পের বই পড়তে পাই নি। কি বই দেবেন দিন, আমি ততক্ষণ ব'সে ব'সে পড়ি, তারপর আপনার কায হয়ে গেলেই এক সঙ্গে যাবো।

অমিয় কহিল,—বই তোমাদের ঠিক করেই রেখেছি, তুমি নিয়ে যাও ; লাইব্রেরীর বইগুলোর লিষ্ট তৈরী করতে আমি এখন ভারি ব্যস্ত আছি। আসছে রবিবার নাগাদ যাবো নিশ্চয়ই।

সত্যই অমিয় বইগুলি বাছিয়া রাখিয়াছিল। টেবলের ড্রয়ার খুলিয়া দুইটি তাড়া সে বাহির করিল। একটি তাড়ায় একখানি মাত্র বই ফিতা

দিয়া আষ্টেপৃষ্টে এমনভাবে বাঁধা যে তাহার নামটি পর্য্যন্ত পড়িবার যো নাই। আর একটি তাড়ায় তিনখানি রঙচঙে বই—সেগুলি শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত।

অমিয় ফিতাবাঁধা বইখানা সুধাকে দিয়া কহিল,—এ বইখানা তোমার দিদির, তাকে দেবে। খবরদার! তোমরা যেন এ বই পড় না।

সুধার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল, কহিল,—তাই বুঝি ফিতে দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন! কিন্তু বাঁধন খুলে পথেই যদি পড়ি?

অমিয় কহিল,—তা হ'লে অন্যায় করা হবে, সেটা কি উচিত? এ বই তোমরা বুঝতে পারবে না। তোমাদের বই এইগুলো।

সুধা তিনখানা বইয়ের তাড়াটি সাগ্রহে লইয়া কহিল,—আমাদের পড়বার জন্যে তিনখানা বড় বড় বই দিলেন, আর দিদিকে মোটে একখানি! সে ত এক ঘণ্টাতেই শেষ ক'রে ফেলবে। এটা কত আর পাতা হবে।

অমিয় কহিল,—এ বইখানা ভারি শক্ত, অত শীগগির শেষ করতে পারবে না। তোমার দিদিকে বলবে, বইখানা যেন অন্তত তিন বার পড়ে। তার পর, রবিবার বিকেলের দিকে গিয়ে আমি বইগুলো নিয়ে আসবো। এ ক'দিন তোমাকে আর আসতে হবে না।

সুধা কহিল,—তা হ'লে দিদিকে বলবো আপনি রোববার বিকেলে ঠিক যাচ্ছেন?

অমিয় মাথা নাড়িয়া তাহাতে সম্মতি জানাইল।

চার

সদয় বাবু দিন চারেক পরে অমিয়কে দেখা করিতে বলিয়াছিলেন। অমিয় ঠিক সাত দিনের মাথায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল।

সে দিন রবিবার; সদয় বাবুর বাড়ী থাকিবার কথা। অমিয় মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াই বাহির হইয়া পড়িল।

সদয় বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে দেখিল, বাহিরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ; বাড়ীখানা নিস্তব্ধ—কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অমিয় সজোরে কড়া দুইটি নাড়িয়া দিল। তাহার তীক্ষ্ণ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—কে?

অমিয়র মুখের উপর উল্লাসের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, উত্তর দিল,—আমি, অমিয়।

খট্ করিয়া একটু শব্দ হইতেই অমিয় বুঝিল, দরজা অর্গলমুক্ত হইয়াছে। আস্তে আস্তে কবাট দুইখানি ঠেলিয়া প্রবেশ-পথ মুক্ত করিতেই সে দেখিল, দরজার পাশটিতে সঙ্কুচিতভাবে সাবিত্রী দাঁড়াইয়া আছে। উভয়েরই চোখাচোখি হইবার ইহা একটি সুন্দর ক্ষণ, কিন্তু সাবিত্রীর দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে অমিয়র ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটিল না; তথাপি, মুক্ত দ্বারপথে পশ্চিমে অবনমিত সূর্য্যের রক্তিম আভাটুকু তাহার লজ্জাবনত মুখখানির উপর পড়িয়া যে সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করিতেছিল, তাহাও অনবদ্য।

ভিতরে ঢুকিয়াই অমিয় নিজে দরজাটি বন্ধ করিয়া অর্গল টানিতেছিল, কিন্তু সাবিত্রী মৃদুকণ্ঠে কহিল,—খিল দেবেন না, এখুনি ওঁরা আসবেন।

অমিয় ফিরিয়া প্রশ্ন করিল,—বাড়ীতে আর কেউ এখন নেই?

নতমুখে সাবিত্রী উত্তর দিল,—না।

—কোথায় গেছেন সকলে তোমাকে একলা ফেলে?

—বাবা বেরিয়েছেন; সুশীরা মা'র সঙ্গে পাশের বাড়ীতে তত্ত্ব দেখতে গেছে, মা এলেন ব'লে।

—তুমি যাও নি?

—আমি কোথাও যাই না।

—তা হ'লে আমি এখন যাই, একটু পরেই না হয় আসবো—

সাবিত্রী এবার মুখখানি আস্তে আস্তে তুলিয়া তেমনই মৃদুস্বরে কহিল, —বাইরের ঘর খুলে দিচ্ছি, আপনি বসুন। মা জানেন, আজ আপনার আসবার কথা আছে। সুধা এতক্ষণ ছিল, এইমাত্র কি একখানা বই আনতে ও-বাড়ীতে গেছে।

কথাগুলি বলিয়াই সাবিত্রী কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। অমিয় অভিভূতের মত এই গাম্ভীর্য্যময়ী কিশোরীটির অচপল গতির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই বাহিরের দিকের দরজাটি খুলিয়া দিয়া আহ্বানের ভঙ্গীতে শান্তস্বরে সাবিত্রী কহিল,—আসুন।

ঘরের ভিতর ঢুকিয়া অমিয় দেখিল, সাবিত্রী ভিতরের দিকের দরজাটি আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। অমিয়র মনে হইতেছিল, অন্যান্য দিন এই দরজার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া সাবিত্রী এই ঘরের আলোচনা কি উৎসাহেই শুনিয়াছে এবং এই পথেই তাহার কৌতুকোদ্ভাসিত দুইটি চক্ষু অন্যের অলক্ষ্যে কতবারই অমিয়র বিহসিত মুখখানির দিকে ফেলিয়াছে, আজ দরজার ব্যবধান নেই, ঘরে তাঁহারা দুইটিমাত্র প্রাণী, প্রায় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু সে দৃষ্টি আজ কোথায়? আঁখির সেই অপূর্ব্ব হাসিটুকু মুখের নীরব গাম্ভীর্য্যের মধ্যে নিঃশেষ

করিয়া দিয়া আজ সে যেন নিষ্প্রাণ প্রতিমার মত দরজাটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই। অমিয়ই সহসা প্রশ্ন করিল,—ওঁরা যে তত্ত্ব দেখতে গেছেন বললে, কিসের তত্ত্ব?

সাবিত্রী ধীরে ধীরে উত্তর দিল,—নন্দী কাকার মেয়ের বে' পরশুদিন হ'ল যে, আজ তাদের ফুলশয্যা, তারই তত্ত্ব যাচ্ছে।

অমিয় কহিল,—ও!

পরক্ষণেই সে সাবিত্রীর দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসি মুখে কহিল,—দিন কতক পরে এ বাড়ীতেও এই রকমের একটা তত্ত্বের আয়োজন হবে।

সাবিত্রী আস্তে আস্তে তাহার আনত দুইটি চক্ষু তুলিয়া অমিয়র দিকে চাহিল। অমিয় ভাবিল, তাহার বিদ্রূপোক্তিটার জবাব দিতেই সাবিত্রী উন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া যে প্রশ্নটা তৎক্ষণাৎ বাহির হইল, অমিয় তাহা শুনিবার প্রত্যাশা করে নাই এবং জবাব দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও আসে নাই।

—আচ্ছা, সে দিন সুধার হাত দিয়ে সে বইখানা আমাকে পাঠিয়েছিলেন কি উদ্দেশ্যে?

নূতন প্রশ্ন। কতদিন হইতেই অমিয় সাবিত্রীকে লাইব্রেরীর বই সরবরাহ করিতেছে, তাহার পাঠ্য গ্রন্থগুলি সে নিজেই নির্ব্বাচিত করিয়া দেয়, কোনদিন এ সম্বন্ধে সাবিত্রীর মুখ দিয়া কোন অভিযোগ উঠে নাই; আজ এই প্রথম কৈফিয়ৎ চাহিতেছে সে অমিয়র নিকট—সে বইখানা পাঠিয়েছিলেন কি উদ্দেশ্যে!

সাবিত্রীর প্রশ্নটা অমিয়কে অভিভূত করিল কি?

মনের ও মুখের ভাবটুকু লুকাইতে অমিয় থপ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার পর সাবিত্রীর দিকে দৃষ্টিটা ফিরাইতেই

দেখিল, সে তাহার দিকেই স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং তাহার মুখের প্রশ্ন সেই দৃষ্টিকে যেন প্রখর করিয়া তুলিয়াছে।

অমিয় কহিল,—তক্তপোষটার ওপর ব'স না, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে।

—দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস আমার আছে। আমার কথাটার জবাব ত দিলেন না ?

কি জবাব দেব ? যে উদ্দেশ্যে রোজ বই পাঠাই, সেই উদ্দেশ্য ছাড়া আর কি থাকতে পারে ?

—ফিতে দিয়ে বেঁধে অত সাবধান হযে ওটা পাঠাবার কারণ ? কোনো দিন ত ও ভাবে কোন বই পাঠান নি !

—তার কারণ, পাছে বইখানা ছেলেরা পড়ে ; বুঝতেই ত পেরেছ, ওটা ছেলেদের পড়বার বই নয়।

—ছেলেদের হাতে যে বই পড়তে দিতে আপনার বিবেকে বাধে, আমাকে সে বই পড়তে দিলেন কি হিসেবে ? আমি মেয়ে ব'লে ?

—ছেলেদের বলতে ছেলেমেয়েদেরই বোঝায়, অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা, যেমন সুধা, সুশী এই সব আর কি। আমি চাই না, ওরা ঐ বইখানা পড়ে।

আর আমি ঐ বইখানি পড়ি, খুব ভাল ক'রে পড়ি, এমন কি পড়ে মুখস্থ ক'রে ফেলি, এটা আপনি নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন ?

—কি আশ্চর্য্য ! একখানা বই নিয়ে তুমি আজ এত কথা তুলছ কেন ?

—প্রয়োজন হয়েছে তাই, আপনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকছেন তাই, আপনার আসল উদ্দেশ্য এই বইখানাকে উপলক্ষ ক'রে জানাতে চেয়েছেন, তাই।

—এর মানে ?

—মানে কি আমাকে আরো স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে ?

—আমি যখন বুঝতে পারছি না, তখন তা ভিন্ন উপায় কি ?

—বুঝতে আপনি পেরেছেন, তবে ধরা দিতে চাচ্ছেন না। আচ্ছা, আমাকে বলবেন আপনি, বেছে বেছে এই বইখানাই আমাকে পাঠালেন কেন ? যে বইয়ে আমারই বয়সী একটি মেয়ে বিয়ের সম্বন্ধে তার বাবাকে শাসাচ্ছে এই ব'লে—'ব্যাপারটা যখন আমাকে নিয়ে, কখন আমাকে না ব'লে কেন তাঁদের কথা দিয়েছ ? আমার জীবন নিয়ে তুমি খেলা করছ কোন্ অধিকারে ? তোমায় বৃহৎ কর্ত্তৃত্বের খেয়ালে আমাকে আজ দাবার ঘুঁঠি হতে হবে. পণ্য হ'তে হবে ?' যে অপরিচিত পুরুষ দেখতে এসেছে আমাকে, তোমার হুকুমে রঙিন সাড়ী পরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তার চোখের সামনে রাস্তার নির্লজ্জ স্ত্রীলোকের মত। আমার বাপ হয়ে এ প্রস্তাব করতে লজ্জায় তুমি মরে গেলে না ?'

কম্পিত ও অস্বাভাবিক কণ্ঠেই সাবিত্রী শেষের কথাগুলি মুখস্থ করা পাঠের মতই আবৃত্তি করিল। অমিয় নিষ্পলকনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সাবিত্রী একটু থামিতেই সে তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল,—বাঃ ! সেই বইখানার মেয়েটির মত তুমিও দেখছি উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছ !

সাবিত্রী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল,—এইটিই আপনার আসল উদ্দেশ্য ছিল !

অমিয় মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল,—তোমার এ কথাটাও হেঁয়ালীর মত দুর্ব্বোধ্য।

এতক্ষণ পরে সাবিত্রীর মুখে হাসির একটু ঝিলিক দেখা দিল, কিন্তু তাহা বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ, চক্ষু যেন ঝলসিয়া দেয়।

অমিয় কহিল,—হাসলে যে !

—ইচ্ছে ক'রে কেউ বোকা সেজে নেকামী করছে, এটা বুঝতে পারলে যেমন রাগ হয়, তেমনি হাসিও পায়। কিন্তু সে হাসির কোন দাম নেই।

অমিয়র মুখখানা যেন সহসা কাল হইয়া গেল। সাবিত্রী যে এভাবে তাহাকে আঘাত দিতে পারিবে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই।

কিন্তু সাবিত্রী তাহাকে ভাবিবারও অবসর দিল না, দুই চক্ষুর দৃষ্টি তীব্রতর করিয়া অমিয়র দিকে চাহিয়া সে চরম প্রশ্ন করিল,—আমার ব্যাপারটা নিযে আমিও ঐ বেহায়া মেয়েটার মত বাবার সঙ্গে ঝগড়া করি—এই উদ্দেশ্যেই কি ঐ কদর্য্য বইখানা অত সাবধানে আমাকে পাঠান নি?

অমিয়র পৌরুষ এতক্ষণে সচেতন হইয়া উঠিল। যে মেয়েটি তাহারই সৌজন্যে অসংখ্য সদ্‌গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে, চরিত্রগঠনের উপযুক্ত গ্রন্থরাজি যোগান দিয়াছিল বলিয়াই যে আজ গল্পের ভিতর হইতে এ ভাবে দুর্নীতির বীজাণু আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, তাহার শিক্ষাপটুতা এই শিক্ষাভিমানী ছেলেটির মনে যে পরিমাণে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল, শিক্ষা-দাতাকে এ ভাবে আঘাত দিবার স্পর্দ্ধা ততোঽধিক অভিমানও সঞ্চার করিয়া দিল। এ অবস্থায় শিক্ষকোচিত দৃঢ়তায় ছাত্রীকে স্তব্ধ করিতে না পারিলে শিক্ষকের মর্য্যাদা থাকে না।

সুতরাং ম্লান মুখখানায় একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি জোর করিয়া ফুটাইয়া তদনুযায়ী দৃঢ়স্বরেই অমিয়কে কহিতে হইল,—যদি বলি, হ্যাঁ তাই; তোমাকে নিয়ে তোমার বাবা যে সব কেলেঙ্কারি আরম্ভ করেছেন, তাতে তুমি প্রতিবাদ করবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে ব'লে ঐ বই-খানা আদর্শস্বরূপ পাঠান হয়েছে?

শিক্ষকের যুক্তিটা ছাত্রীর দেহমনে চাবুকের আঘাত দিল বটে,

কিন্তু সে আঘাতের জ্বালাটা ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির আকারে প্রকাশ করিয়া তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে সে কহিল,—আদর্শটা ঠিক সেই রকমই হয়েছে ব'লে মেনে নিতে হবে—রোগীর কষ্ট দেখে হাতুড়ে বদ্যি তাকে মুক্তি দেবার জন্য এক মোড়া সেঁকো বিষ যেমন তার মুখে ঢেলে দিয়েছিল!

অমিয় উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—অল্প বিদ্যা যে ভয়ঙ্করী হ'য়ে ওঠে, এ সব তারই লক্ষণ।

মুখে হাসির রেখাটি পুনরায় ফুটাইয়া সাবিত্রী কহিল,—অধিক বিদ্যাই যে শুভঙ্করী হয়, সেটা প্রমাণ করেছে গল্পের ঐ মেয়েটি, কেমন?

অমিয় এবার তর্জ্জনের সুরে কহিল,—তুমি শুধু গল্পটুকুই পড়েছ,ওর মর্ম্ম কিছু বোঝ নি। চেনা রাস্তা থেকে মোড় ফিরিয়ে নতুন পথে অনেক কিছু দেখতে পাবে বলেই ও বইখানা পাঠিয়েছিলুম। ওটা ত শুধু ও রাস্তার হাতেখড়ি বললেই হয়।

—তা হ'লে এর পর গলার দড়ির ব্যবস্থাও আছে বলুন। কিন্তু এ রাস্তায় হাতেখড়ি দিয়েই যে প্রথম ভাগটি আমি পেয়েছি, তাতেই আমাকে হাঁফিয়ে উঠতে হয়েছে। বইখানা পড়ে অবধি আমার দেহ মন যেন বিষিয়ে উঠেছে, ঘেন্না ধরে গেছে বইয়ের ওপর, লেখার ওপর, লেখকদের ওপর।

—তা হ'লে বই পড়াটা বয়কট করতে চাও বল!

—সেই ইচ্ছেই হয়, তাই উচিত; একজনের দোষ দেখে মহাত্মা গান্ধী সারা দুনিয়াটার ওপর রাগ ক'রে উপোস ক'রে মরতে চেয়েছিলেন। আমাদেরও উচিত, যে বইয়ে মেয়েদের এমন কদর্য্য ক'রে দেখায়, সে বই পুড়িয়ে দেওয়া; তার লেখককে শাস্তি দেওয়া।

—লেখক তাঁর রচনায় যেটা সৃষ্টি করেন, সেটা সত্যি, মিছে নয়।

—মিছে নয়? আমাকে আপনি দেখিয়ে দিতে পারেন, আমাদের এত বড় সমাজের মধ্যে কোনো মেয়ে তার বাপের মুখের ওপর ঐ রকম কথা বলেছে?

—আমাদের সমাজে ক'টা শিক্ষিতা মেয়ে আছে?

—অনেক আছে। আপনার বিচাবে শিক্ষিতা কারা? আপনার ঐ গল্পের মেয়েটির শিক্ষার দৌড় ত আই-এ ক্লাস পর্য্যন্ত, পাসও তিনি তখনো করেন নি, তাতেই অত ঝাঁঝ! কিন্তু আমাদের পাড়াতেও এমন দু'তিনটি বউ এসেছে—যারা আই-এ পাশ করা, কিন্তু তাদের চাল-চলন আচার-ব্যবহার দেখে কে বলবে যে তারা অত বেশী পড়েছে! আমি ঐ বইখানা তাদেরও পড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সত্যি কি এমন আজকাল হচ্ছে? কিন্তু আপনি শুনে হয় ত আশ্চর্য্য হবেন, ওরা সকলেই বলেছে—এ সব বাজে, ও-দেশেব লেখকদের লেখা হুবহু নকল করা। ওদের মনগড়া ছেলেমেযে কেতাবেই থাকে, সমাজে নেই। ওরা যে সব কথা ছেলেমেয়ের মুখ দিয়ে বলায়, আমাদের সমাজে সে সমস্যা এখনো ওঠে নি। তবে যে রকম ক'রে ওরা বিষের ধোঁয়া ছাড়তে সুরু করেছে, তাতে হয় ত ঐ সব সমস্যাও আমাদের সমাজে আসবে, ছেলেমেয়েও ঐ ভাবে তৈরী হবে। ছেলে তার বাবার মুখের ওপর বলবে—আমার মন বুঝে তোমাকে চলতে হবে, যখন আমার জন্মের জন্য তুমি দায়ী। আর মেয়েও চোখ রাঙিয়ে জানাবে—আমার জীবন নিয়ে তোমরা খেলা করতে পার না। যেমন ঐ বইখানার ছেলেমেয়ে বলেছে।

—কিন্তু এটা কি ওদের পক্ষে প্রশংসার কথা নয়? ওদের সাহসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না? অন্যায় সহ্য ক'রে মুখচোরার মত মুখ বুজিয়ে থাকার চেয়ে মনের কথা খুলে বলা কি দোষের?

—মনের কথা নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার সাজে না; কেন

না, আমার অত পড়াশোনা নেই ; তা ছাড়া, আমার ধারণা, সকলের মনের কথা সমান নয়, কিন্তু এই বয়সে আমার মনের কথা আমি যতটুকু জানি, তাতে আমি জোর ক'রে বলবো—ওটা দোষের, ওকে সাহস বলে না, ওতে প্রশংসার কিছু নেই।

—তোমার কাছে আজ তা হ'লে একটা নতুন কথা শেখা গেল দেখছি।

—এ কথা শুধু আমার নয়, আমাদের সমাজের সমস্ত মেয়ের কথা। অনেক মেয়েই ত এ অঞ্চলে আছে, তাদের বিয়েও হয়েছে ; কিন্তু ভালো ঘরে ভালো বরে সবাই যে পড়ে নি, তার অনেক খবর আপনিও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু জোর করে বলতে পারেন, এমন একটি মেয়ের নাম আপনার মনে আসে—যে বিয়ের আগে মুখ তুলে বাপের মুখের ওপর আপত্তি তুলেছে?

—অতঃপর তারা যাতে আপত্তি তুলতে পারে, সেই জন্যই গ্রন্থকার ঐ ধরণের বই লিখতে আরম্ভ করেছেন।

—আর একটা বড় লাইব্রেরীর ভার হাতে পেয়ে তার ভেতর দিয়ে ঐ বিষের ধোঁয়া ছড়িয়ে আপনি দেশের ছেলেমেয়েগুলোর মাথা বিগড়ে দেবার ব্রত নিয়েছেন? কি বলবো, অভিভাবকরা কিছুই দেখেন না, সংসার নিয়েই ব্যস্ত—কিসে উপায় ক'রে ছেলেমেয়েদের সুখী করতে পারেন ; অন্য দিকে তাঁদের দৃষ্টি দেবার ফুরসৎ নেই, তাই এটা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি করেছি এরই মধ্যে শুনবেন?

—বল, অনেক কিছুই আজ আমাকে শুনতে হবে।

—তিনটি পাস করা শিক্ষিতা, আর আমার মতন অল্পবিদ্যের গুটি-কতক ভয়ঙ্করী মেয়ে মিলে ঐ বইখানার বহ্ন্যুৎসব করেছি।

—য়্যাঁ? বইখানা পুড়িয়ে ফেলেছ তোমরা? লাইব্রেরীর প্রপারটি—

—শুধু তাই নয়, আমরা স্থির করেছি, ঐ লেখকের বই যদি লাইব্রেরীতে এর পর রাখা হয়, আমরা লাইব্রেরীকে বয়কট করবো।

—বল কি, একখানা বই নিয়ে তোমরা এতটা খাপ্পা হয়ে উঠেছ?

—আর ঐ বইখানা পাঠিয়ে আপনি আমাকে যে অপমান করেছেন, তার কি প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হয়েছে তা বোধ হয় এখনো শোনেন নি?

অমিয় কথাটা শুনিবা মাত্র সচকিতভাবে সোজা হইয়া বসিল এবং দুই চক্ষুতে প্রশ্ন ভরিয়া সাবিত্রীর দৃপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

সাবিত্রী গাঢ়স্বরে কহিল,—বাবা আমার যে সম্বন্ধ স্থির করেছেন, ভগবানের নির্দ্দেশের মতই তাই আমি মেনে নিয়েছি,—এতেই আমার সান্ত্বনা।

ঠিক এই সময় বাহিরের দরজাটা ঠেলিয়া কাহারা ভিতরে ঢুকিল, সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীও অর্দ্ধমুক্ত দরজার কবাট দুইখানি টানিয়া দিয়া ছায়ার মত ভিতরে সরিয়া গেল।

পাঁচ

গৃহিণী মনোরমা দেবী বাহিরের ঘরের দরজা খোলা দেখিয়াই অবগুণ্ঠনটি তাড়াতাড়ি টানিতেছিলেন, সুশী বাধা দিয়া কহিল—আর কেউ নয় মা, অমিয়-দা একলা আছে।

মনোরমা দেবী হাসি মুখে বাহিরের ঘর দিয়াই ভিতরে চলিলেন। অমিয়কে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—কতক্ষণ এসেছ, বাবা? এ ক'দিন আসনি কেন? শরীর ভাল আছে ত?

অমিয় সংক্ষেপে উত্তর দিল,—ভাল আছি, কাষের ভীড়ে কদিন আসতে পারিনি।

ব'স বাবা, চা ক'রে পাঠাচ্ছি; আর বল কেন; নন্দীর জামাইকে ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠাচ্ছে, দেখবার জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তা খুব দিয়েছে, দশজন লোক যাবে নিয়ে।

—কিন্তু ওঁর অবস্থা ত খুব ভালো নয় শুনেছি, বাজারে দেনা, উপায় তেমন নেই, তবুও—

—তা বললে কি হয়, বাবা, এ যে কন্যেদায়। শুন্‌লুম, বরপক্ষ ফুলশয্যার টাকা ধরে নিয়েছিল, শুধু ফুল-চন্দন আর মেয়ে জামায়ের কাপড় জলখাবার পাঠাবার কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের রাতে বরের বাপ নন্দী বাবুকে ডেকে বলে যান—কথা আছে ব'লে যেন একবারে নমো নমো ক'রে সারবেন না, বেই; সমাজ গাঁ, ফুলশয্যার তত্ত্ব দেখতে দশ বাড়ীর মেয়ে আসবে, ভালো বললে আপনারই সুখ্যেত আর আমাদের মুখ উজ্জল হবে।—নন্দী বাবুর পয়সা না থাক, নজর ত আছে। আরো একশো টাকা যোগাড় ক'রে তত্ত্ব পাঠাচ্ছেন তাই। দেখে শুনে আমার হাত-পা ত পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে, বাবা! আমার কি যে হবে, তিনিই জানেন।

একটু পরেই সুধাও বাড়ীতে ঢুকিল। অমিয়কে দেখিবামাত্র মুখখানা কাল করিয়া সে কহিল,—শুনেছেন অমিয়-দা, দিদিটার কাণ্ড! অত যত্ন করে বই আপনি পাঠালেন, আর ওঁরা কি না ক'জনে মিলে সেটা পুড়িয়ে দিয়েছে। দিদির কাছ থেকে ও বইয়ের দাম আপনি আদায় ক'রে নেবেন, অমিয়-দা?

এ সম্বন্ধে অমিয়র কি অভিমত, তাহা আর সুধার শোনা হইল না; গৃহদ্বারে পরিচিত একটা উচ্চ কাসির শব্দ শুনিয়াই সে কহিল,—ঐ রে, বাবা! বসুন অমিয়-দা, আমি দেখে আসি চায়ের কত দেরী।

সুধা এক দ্বার দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল, অন্য দ্বার দিয়া সদয় বাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমিয়কে দেখিবামাত্র তিনি কহিলেন,—তোমার কথাই ভাবছিলুম, অমিয়। আজ তুমি না এলে সুধাকে দিয়ে ডাকতে পাঠাতুম।

গায়ের জামাটা খুলিয়া দেওয়ালে আঁটা একটা আনলায় ঝুলাইয়া রাখিয়া সদয় বাবু তক্তপোষে তাকিয়াটি ঠেস দিয়া বসিলেন।

অমিয় তৎপূর্ব্বেই চেয়ার হইতে একটু উঠিয়া হাত দুইখানি তাঁহার উদ্দেশে কপালে ঠেকাইয়া নিরুত্তরে শ্রদ্ধাভিবাদন সারিয়া লইয়াছিল।

সদয় বাবু সহাস্যে কহিলেন,—নতুন রাস্তাটা ধরে সত্যিই হোঁচট খেতে হয়নি হে, সিদ্ধি এ পথে অনেকটা পেয়েছি।

অমিয়র মনের ভিতরের যত কিছু জ্বালা দুইটি চক্ষুতে যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল, একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

সদয় বাবু কহিলেন,—তিন দিন বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল, তাতে চিঠি পেয়েছি মোটের ওপর পনেরো খানা; সেগুলোর ভেতরে চোদ্দখানা বাজে, একখানা কাযের।

অমিয় শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—কাযের খানা নিয়েই তা হ'লে কায এগিয়েছে বলুন!

সদয় বাবু কহিলেন,—আগে বাজেগুলোর কথা বলি শোনো, বাজে হ'লেও প্রত্যেক চিঠিখানাই ভারি মজার, চিঠির তাড়াটা আফিসে টেবিলের ড্রয়ারে ফেলে এসেছি, নইলে তোমাকে পড়ে শোনাতুম। ওঁদের কেউ পাঞ্জাবী, কেউ সিন্ধি, কেউ বিহারী, কেউ মাদ্রাজী, কেউ গুজরাটী, বাঙ্গালীর মেয়ে বিয়ে করতে প্রত্যেকেরই খুব উৎসাহ, টাকা খরচ করতে পেছপাও নয় কেউ। বড় বড় লোকের সার্টিফিকেটও চিঠির সঙ্গে জনকতক উমেদার পাঠিয়েছে, এতেই বোঝ ব্যাপার কি রকম! যাক্, এবার

কাযের চিঠিখানার কথাই শোনো,—আমাদের সমাজের এই একমাত্র লোক উমেদার হয়েছে। অবস্থা ভাল, আমাদের স্বঘর, কলকেতায় বড় কারবার আছে, মাসে বেশ মোটা টাকা আয়। ফরিদপুরে দোতলা বাড়ী, পুকুর বাগান, বিষয় আসয়ও বিস্তর; মেয়েকে সোনা দিয়ে মুড়ে নিয়ে যেতে রাজী, কোনো খরচ-পত্তরই আমাদের নেই।

অমিয় বার দুই কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল,—যা বলছেন, অবস্থা ত তাতে খুব ভালোই বোধ হচ্ছে, কিন্তু এদিকে আর সব—পড়া-শোনা, স্বভাবচরিত্র, দেখতে শুনতে ছেলেটি কেমন?

সদয় ঘোষালের উৎসাহ যেন এই প্রশ্নে সহসা অনেকটা লঘু হইয়া গেল এবং মুখে একটা অস্বস্তির ছায়া পড়িয়া কণ্ঠের স্বরটাকেও ঈষৎ বিকৃত করিয়া দিল। কহিলেন—এই দিকেই যা কিছু গলদ; কেন না, পাত্রটিকে ছেলে বলা চলে না, বরং ছেলের বাবা বলেই ধরে নিতে পার।

অমিয় এতক্ষণে সাবিত্রীর শেষের কথাটার অর্থ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বাঙ্গের শিরাগুলি বুঝি এক সঙ্গে মোচড় দিয়া উঠিল। অতি কষ্টে মুখে কৃত্রিম প্রফুল্লতার ভাব ফুটাইয়া সে প্রশ্ন করিল,—বয়স কত হয়েছে তাঁর?

—তা হয়েছে বই কি, পঞ্চাশের এদিকে ত নয়ই, বরং ওদিকেই গড়িয়ে পড়েছে; তবে ভোগে আছে, অভাব নেই, তাই দেহ এখনো বেশ শক্ত রয়েছে দেখলুম। আমাদের চেয়েও মজবুত।

—এ বয়সে বিয়ে করতে ঝুঁকেছেন কেন?

—কতকটা খেয়াল, কতকটা ছেলেদের ওপর অভিমান।

—ছেলেও তা হ'লে আছে?

—বিলক্ষণ! দুটি ছেলেই উপযুক্ত; একটি বিষয়-আশয় দেখে, অন্যটি আইন পড়ে। বিয়ে-থাও দিয়েছেন। কিন্তু ছেলে আর বৌদের

সঙ্গে বনিবনাও হ'চ্ছে না তাঁর। বছরখানেক হ'ল স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, সেই থেকে সংসারেও অশান্তি দেখা দিয়েছে। এখন এঁর ইচ্ছে এই, দেশের বিষয়-সম্পত্তি ছেলেদের দিয়ে, কলকেতায় কারবার নিয়ে নিজে আলাদা হ'য়ে থাকেন।

—আপনি রাজী হয়েছেন?

—না হ'য়েই বা করি কি বল? এদিক্‌টা ভাবলেই মনটা দমে যায়, কিন্তু আমাদের সমাজের দিকে চাইলেই মনটা আবার দপ ক'রে জ্বলে ওঠে। এর আগে যখন সোজা রাস্তা ধরে বিনা পণে মেয়েটিকে নেবার জন্য সমাজের দোরে ধর্ণা দিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপাই, তখনো সাড়া পাইনি, এবার উল্টো রাস্তা ধরতে পরদেশী ছেলেরা ঝুঁকে পড়্‌লো, কিন্তু সমাজের একটা ছেলেও এগুলো না,—কাযেই যে লোকটি আমাদের ঘুমন্ত সমাজ থেকে মুখ তুলে চেয়েছে, আমার মুখ রাখ্‌তে হাত দু'খানা বাড়িয়েছে, তখন তাকে মেনে না নিয়ে উপায় কি বল? বিশেষ মেয়েরও যখন অমত নেই।

—দেখাশোনাও তা হ'লে হয়েছে বলুন?

—নিশ্চয়ই। সাবিত্রীকে দেখে তিনি যতটা খুসী হয়েছেন, তার কথায় তার চেয়েও বেশী খুসী হ'য়ে গেছেন।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি অস্বাভাবিক রকমে উজ্জ্বল করিয়া অমিয় সদয় বাবুর মুখের দিকে তাকাইল। সদয় বাবু কহিলেন,—আমার সামনেই তিনি সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আমাকে বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছে হয়? শুনে সাবিত্রী উত্তর দিয়েছিল—বাবার ইচ্ছার 'ওপর আমার কোনো কথা থাক্‌তে পারে না।

অমিয়র সমস্ত দেহমন মন্থন করিয়া একটা হাহাকার যেন শ্বসিয়া উঠিল; কিন্তু তাহার বিবর্ণ মুখখানির ভিতর দিয়া একটি স্বরও আর বাহির হইল না।

এই সময় উভয়ের জন্য চা আসিল, সঙ্গে ঘৃত, মরিচ ও নারিকেল-কুচির সংযোগে তরিবত করা তাজা মুড়ি। সদয় বাবু উৎসাহের সুরে কহিলেন,—খাও অমিয়, চায়ের সঙ্গে লাগবে ভাল।

অমিয় কোন রকমে চা-টুকু গিলিয়া অবেলায় গুরু আহারের দোহাই দিয়া মুড়িগুলি ফিরাইয়া দিল। মনে যে প্রচুর ক্ষুধা লইয়া সে এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহার উপর একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ চাপাইয়া তাহাকে ম্লানমুখে ফিরিতে হইল।

ছয়

বাড়ীতেও সে রাত্রে অমিয় জলস্পর্শ করিল না, মাকে জানাইল, অন্যত্র প্রচুর জলযোগ করিয়াছে, ক্ষুধা নাই। বিছানায় শুইয়াও যেন তাহার শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইল। চক্ষুর পাতায় নিদ্রার ছায়া কিছুতেই পড়িতেছিল না, কেবলই সাবিত্রীর মুখখানা স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার প্রতিটি কথা তীরের মত অমিয়র বুকে বিঁধিতেছিল।

সাবিত্রী কি তাহাকে ভুল বুঝিয়াই এ ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে ছুটে নাই? তাহার এই আত্মদান কি আত্মহত্যা নহে!—কিন্তু অমিয় কি সত্যই অপরাধী? কৌতুকচ্ছলে তাহার এই পরীক্ষার স্পৃহাটা আগুন লইয়া খেলা করার মতই হয় নাই কি এবং অসতর্কতায় নিজের মুখখানাও কি তাহাতে পুড়াইয়া ফেলে নাই? কেন সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রথম দিনেই নিজের সঙ্কল্পের কথা সাবিত্রীর বাবার নিকট প্রকাশ করে নাই! কিন্তু এখন? তীর হাত হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, ফিরাইবার আর ত উপায় নাই।

পর দিন যথাসময় অমিয় ভাতের কাছে বসিল মাত্র, কয়েক গ্রাস মুখে

দিয়াই উঠিয়া পড়িল। মা বাধা দিতে ছুটিয়া আসিলেন, উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন,—উঠে পড়লি অমি, হাতে-ভাতে করাই সার হ'ল! কি হয়েছে তোর বল্‌তো শুনি?

মুখ ধুইতে ধুইতে অমিয় কহিল,—কি আবার হবে! গাটা কেমন গুলিয়ে উঠলো, খেতে আর ইচ্ছে হ'ল না তাই।

মা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কাল রাত্রেও অমিয় আহার করে নাই, আজও তাহার আহার করিতে রুচি নাই! তাহার দুই চক্ষুর কোলে যেন কালি পড়িয়াছে, সুন্দর মুখখানা শুষ্ক, বিবর্ণ; কেন—কেন?—বহুদর্শিনী বর্ষীয়সী জননীর মর্ম্মভেদী দৃষ্টি কি অমিয়র অন্তরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে পারিয়াছিল?

আফিসে সেদিন খুবই কাযের ভীড় ছিল। অমিয়কে উপর্য্যুপরি কয়েকবার মালিকের খাস-কামরায় আসিয়া তাঁহার উপদেশ লইতে হইয়াছিল। এই অতিপরিশ্রমী, চালাক-চতুর ও হাস্যমুখ ছেলেটিকে কর্ত্তা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত ছিলেন। কিন্তু এ দিন ছেলেটির ভার ভার মুখখানা তাঁহার চিত্তে যেন কেমন একটা দোলা দিয়া গেল। চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া যে সকল প্রভুতশক্তিসম্পন্ন কর্ম্মী অধীনস্থদের অন্তরের ভিতরটুকুও দেখিতে পারিতেন, অমিয়র এই মনিবটিকেও তাঁহাদের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারা যায়।

টিফিনের ছুটির কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই কর্ত্তার ঘরে অমিয়র ডাক পড়িল। অমিয় আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই, অমিয়র শুষ্ক মুখখানির উপর পুনরায় তাঁহার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পড়িল। একটু পরে প্রশ্ন হইল,—তোমার কি অসুখ করেছে, অমিয়?

মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া অমিয় উত্তর দিল,—না, স্যর! আমি ত ভালই আছি।

স্যর কহিলেন,—কিন্তু ভাল থাকবার যেটা আসল লক্ষণ, সেটা তোমার মুখে দেখতে পাচ্ছিনা ত আজ?

কুণ্ঠিতভাবে অমিয় কহিল,—কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি স্যর, তাই হয়তো—

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই কর্ত্তা প্রশ্ন করিলেন,—তোমার সে বিয়ের কি হ'ল হে, অমিয়? যার জন্য তোমার অত লাফা-লাফি, টাকার জন্য দরখাস্ত, আমি মঞ্জুরও করলুম, কিন্তু তার পর যে আর কথা নেই,—সব চুপচাপ, ব্যাপার কি?

শুষ্ক মুখখানাকে কাল করিয়া অমিয় প্রায় আর্ত্তস্বরেই উত্তর দিল,—তার আর দরকার হবেনা, স্যর, সে ভেঙে গেছে।

সোজা হইয়া বসিয়া কর্ত্তা কহিলেন,—কি রকম, কি রকম? ভেঙে গেছে কি হে? তাই বুঝি তুমিও ভেঙে পড়বার মত হয়েছ? বল, বল, ব্যাপারটা কি শুনি।

অমিয় আর রেহাই পাইলনা, কোন কথাই মনের ভিতর চাপিয়া রাখিতে পারিলনা। টাকার কথা পাড়িতে সে দিনও যেমন এই অদ্ভুত মানুষটি জেরা করিয়া সকল কথাই বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, আজও তেমনই করিয়া পরবর্ত্তী সমস্ত ঘটনাই শুনিয়া ফেলিলেন। অমিয় ভাবিবার অবসর পাইলনা, যে সকল কথা গোপন করাই উচিত, শ্রদ্ধাভাজন অন্নদাতার সম্মুখে কিছুতেই ব্যক্ত করা চলেনা, সেই কথাগুলিও কেমন করিয়া সে প্রকাশ করিয়া ফেলিল!

কর্ত্তা দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া একবার অমিয়র দিকে চাহিলেন।

অমিয় বুঝি তখন নিজের অভিভূত অবস্থার মোহটুকু কাটাইয়া অশ্রুর প্রবাহকে রুদ্ধ করিতে চক্ষুর সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছিল। কর্ত্তা কহিলেন,—তা হ'লে নিজের কুড়ালের ঘা নিজের হাতেই মাথা পেতে নিয়েছ বল! ব্যস তবে আর কি। তোমারও ছুটী, আমারও নিষ্কৃতি।

সাত

কয়টি ঘণ্টায় কয়টি বৎসরের বয়স বাড়াইবার চিহ্ন শুষ্ক বিবর্ণ মুখ-খানায় ফুটাইয়া অমিয় বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই মা একটু অস্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন,—হ্যাঁ রে, অমি, সদয় ঘোষাল নাকি একটা বুড়ো দোজবরে মিন্‌সের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবে ঠিক করেছে?

অমিয় ঘাড় নামিয়া কথাটায় সায় দিল, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠের স্বরটুকু অস্পষ্টভাবে বাহির হইল,—হুঁ।

মা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—শুনলুম, মেয়েও নাকি তাতে রাজী হয়েছে, মত দিয়েছে ;—সত্যি?

অমিয় পূর্ব্ববৎ সংক্ষেপেই উত্তর দিল,—হ্যাঁ।

মা বিস্ময়ের সুরে কহিলেন,—বলিস্ কি রে? অমন সোনার পিরতিমে, শেষে কি না দোজবরে বুড়োর গলায়—য়্যাঁ!—কণ্ঠ তাঁহার রুদ্ধ হইয়া আসিল, বুঝি কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না।

অমিয় সবিস্ময়ে দেখিল, মায়ের মুখের ভাব আজ অন্তরূপ ; নারীচিত্তের চরম বেদনা বুঝি মুখখানার উপর সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অমিয় কহিল,—সোনার পিরতিমে, তাই ত তারা সোনা দিয়ে মুড়ে নিয়ে যাবে তাকে, মা!

মা ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন,—তুই থাম! পয়সাই কি সব?

অমিয় স্তব্ধ! মায়ের মুখে আজ সে এ কি কথা শুনিল! তথাপি সে কঠিন হইয়াই কথাটার উত্তর দিল,—পয়সাই সব চেয়ে বড় ব'লেই ত আজ এটা সম্ভব হযেছে, মা! ওর বাবা অতটা নামতে পেরেছে, আর বাবার অবস্থা বুঝে তাকেও বুক বাঁধতে হযেছে, মা!

মা এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—তা ব'লে ওরকম ক'রে ওর আত্মহত্যে করা হবে না। আমি মা, আমি এ হ'তে দেব না।

মা দৃঢ়চরণে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

লাইব্রেরীতে যাইবার জন্য অমিয় প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় তাহার বাড়ীর দরজার সম্মুখে একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহী গাড়ীর ভিতর হইতেই ডাকিলেন,—অমিয়, বাড়ী আছ?

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়াই অমিয় উঠিপড়ি অবস্থায় বাহিরে ছুটিয়া আসিল, অপ্রত্যাশিত মানুষটিকে তাহারই গৃহদ্বারে, দেখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল,—স্যর! আপনি?

স্যর কহিলেন,—আমি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রব ব'লে এসেছি, অমিয়।

অমিয় কহিল,—তিনি যে কিছুক্ষণ হ'ল ও-পাড়ায় গেছেন, স্যর!

—কোথায়?

—সদয় বাবুদের বাড়ী।

—সদয় ঘোযাল! এঁরই মেয়ের নাম সাবিত্রী নয়? তোমার মুখে এই নামই শুনিছি মনে হ'চ্ছে।

—হ্যাঁ, স্যর!

—উঠে এসো গাড়ীতে, যেতে যেতে কথা হবে। ড্রাইভারকে তাঁর বাড়ীর রাস্তাটা জানিয়ে দাও।

এক মিনিটের মধ্যেই গাড়ী সদয় বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া থামিল। ঘোষাল বাহিরে আসিতেই পতিতপাবন বাবু হাসিমুখে কহিলেন,—প্রণাম হই, ঘোষাল মশাই! আমাকে দেখে অবাক্ হবার মত কিছু নেই। এই অমিয় ছোকরা আমার আফিসে কায করে। ভারি ভাল ছেলে, তাই আমিও একে ভারি ভালবাসি—বুঝেছেন?

সদয় বাবু সসম্ভ্রমে এই বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিটিকে বাহিরের ঘরে আনিয়া বসাইলেন, ভাবগদ্‌গদ স্বরে কহিলেন,—সব দিক্ দিয়ে সৌভাগ্য আজ আমার কুঁড়েয় ঢুকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে, স্যর। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। অমিয়র মা আমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধারের কথা দিয়ে গেছেন।

পতিতপাবন বাবু কহিলেন,—আমি এসেছিলুম যে কথাটার জন্য, সেটা তা হ'লে আমাকে বলতে হ'ল না। অমিয়র মা নিজেই তা শেষ ক'রে ফেলেছেন। এই ত চাই! আমাদের সমাজের সব মায়ের মন যদি মেয়েদের দরদ বুঝে এমনি ক'রে টনটনিয়ে ওঠে, তা হ'লে তাদের বিয়ে আজ মস্ত দায় হ'য়ে দাঁড়ায় না।

জড়িতকণ্ঠে সঙ্কোচের ভাব ব্যক্ত করিয়া সদয় বাবু কহিলেন,— আপনি লক্ষপতি লোক হ'য়ে স্যর—গরীবের কথা ভাবেন, তাদের গতিমুক্তি করতে এত কষ্ট ক'রে এত দুব এসেছেন, স্যর?

পতিতপাবন বাবু দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—আসবো না? আপনার মেয়ের নির্দ্দেশ যে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে টেনে এনেছে, মশাই! আমি সব শুনিছি,—বইয়ের কথা, তার মনের কথা, বাপের ওপর ভক্তির কথা; শুনে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি—বাঙ্গালা দেশে এমনই মেয়েরই আজ দরকার হয়েছে।

সদয় বাবুর মুখে কথা নাই, বক্তার কথায় তাঁহার দুইটি চক্ষুর কোল তখন অশ্রুর আবর্ত্তে স্ফীত হইয়া কণ্ঠকেও বুঝি রুদ্ধ করিয়াছিল।

পতিতপাবন বাবু কহিলেন,—এখন আমার একটা অনুরোধ এই, ঘোষাল মশাই, এ বিয়েতে আপনাদের কোন তরফেরই কোনো খরচ-পত্তর নেই; সব ভার আমার।

বিপুল বিস্ময়ে সদয় বাবু কহিলেন,—সে কি, সে কি! আপনি স্যর,—আপনি—সব ভার—

পতিতপাবন বাবু কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ, আমিই এ বিয়ের সব ভার নিতে চাই। কেন শুনবেন?

সহসা বক্তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস নাসাপথ দিয়া বাহির হইয়া কণ্ঠের দ্বার যেন খুলিয়া দিল। সে পথ দিয়া যে স্বর অতঃপর বাহির হইল, তাহার প্রতি কথাটি আর্ত্তনাদের মত মর্ম্মবিদারী, এবং অতীতের এক বেদনাময় স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া তাহা এই আত্মত্যাগীর পরিচয় সুস্পষ্ট করিয়া দিল।

—আমি গরীবের ছেলে। এক ধনীর মেয়ের গুণে আকৃষ্ট হ'য়ে আমি তাকে বিবাহ করতে চাই; কিন্তু আমার অর্থের অভাব তাতে অন্তরায় হয়; আমাদের বিবাহ হয় নি। সেই থেকে আমি আর বিবাহ করিনি। আজ অমিয়র সঙ্গে তারই বাঞ্ছিত মেয়েটির মিলনগ্রন্থি বেঁধে দিয়ে আমি আমার অর্থকে সার্থক করতে চাই।

শেষ